জড় ভরত

—*—

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ প্রণীত

—— ০ ——

কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ষ্টুডেণ্টস্
লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

———

(৩য় সংস্করণ)

কলিকাতা
২১।৩ শাস্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
'বিশ্বকোষ-প্রেসে'
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৯

মূল্য ৸৹ বার আনা।

উৎসর্গ

প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সুহৃদ্বরেষু—

আমি জীবনে যে সকল সৌভাগ্যের গৌরব করিয়া থাকি, তন্মধ্যে ভবাদৃশ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তির বন্ধুত্বাভিমান অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ের উত্তেজনার মধ্যে এই পুস্তকবর্ণিত কাহিনীর শ্রোতা অন্যত্র দুর্লভ হইলেও আপনি ইহা উপেক্ষা করিবেন না, এই ভরসায় পুস্তকখানি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম। এরূপ আখ্যান আপনার লেখনীতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, আপনার সাধু-চরিত্র ও পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ লাভ করিয়া তাহা বিশেষরূপে উজ্জ্বল হইত, এই পুস্তক লিখিতে যাইয়া স্বীয় অযোগ্যতার স্মৃতির সঙ্গে এই কথা বারংবার মনে হইয়াছে।

ভবদীয় গুণ-মুগ্ধ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

ভারতবর্ষের একটা বিশেষ কথা আছে, যুগে যুগে ভারতবর্ষ সেই কথা বলিয়া আসিয়াছে। এ দেশে সে কথার ভাণ্ডার অফুরন্ত, সেই কথা বলিতে সে দিনও বঙ্গদেশে রামকৃষ্ণ ও রামমোহন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞমানী লোকেরা বিজ্ঞতার ভাণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা বাতুলের উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু সে কথা—এ দেশের সার কথা। কাবুলে যেরূপ বেদানা জন্মে, বসোরায় যেরূপ গোলাপ জন্মে,—নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দের কথা সেইরূপ বিশেষভাবে ভারতের সামগ্রী!

ভিন্ন দেশের লোকেরা সে কথার মর্ম্ম বুঝুক আর না বুঝুক—আমাদের দেশে রাজা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই সেই কথায় ভাবুক। এই ভাব বুঝিলে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য আমাদের চক্ষে ঘুচিয়া যাবে। মনে হইবে ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির, এখানে দিবারাত্র পূজার কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতেছে। কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ বিল্বপত্র ও তুলসীদাম চয়ন করিতেছে, কেহ সংকল্প করিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সজ্জা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদি লইয়া যেরূপ বিব্রত, সেই গৃহদেবতাকে লইয়াও তেমনি বিব্রত,

তাঁহার সেবা এবং পরিচর্য্যার জন্ম বরং তাহাকে বেশী ভাবিতে হয়। ভগবান্‌কে এরূপ গৃহের গণ্ডীতে আনিয়া অপরিহার্য্য অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে আর কোথায় দেখা যায়! কোটি কোটি কণ্ঠের 'মা' 'মা' শব্দ, কোটি কোটি হস্তের পুষ্পাঞ্জলি জগন্মাতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। এখানে প্রস্তরখণ্ড, মৃন্ময়স্তূপ, অশ্বথ বৃক্ষ সকলই ঠাকুরের প্রকাশ বুঝাইতেছে। এস্থানে ভগবানের নাম অগ্রে না লিখিয়া কেহ দু'কথা লিখিতে চাহে না, এখানে ভগবানের নাম ছাড়া সন্তানের অন্য কোন নাম রাখিয়া পিতা তৃপ্ত হন না, ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কেহ আহারে প্রবৃত্ত হয় না। এখানে যে বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, কেহই স্বশক্তির উপর নির্ভর করে না, 'কোথায় দীনবন্ধু' বলিয়া নিঃসহায়ভাবে তাঁহারই কৃপাভিক্ষা করে। এখানে পথে ঘাটে বৈষ্ণবের দল ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, মায়ের লীলা কল্পনা করিয়া আগমনী গাইতেছে। পঞ্জিকায় প্রতি তিথিতে গৃহস্থের জন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থা আছে। পার্থিব সুখ কিছুই নহে —তাহা বুঝাইবার জন্য শত শত বাউল একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেছে। যাত্রা, কথকতা, কবির গান—সমস্তই ভগবৎ লীলারসে মধুর, পল্লীর কৃষকও সেই রসপানে উন্মত্ত।

এই ধর্ম্মকথায়ই আমাদের ঐক্য। সে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল, কে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল? কুম্ভমেলার সেই সিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় অগণিত যাত্রীর দল কাহার চেষ্টায় একত্র হইয়া থাকে। অন্য প্রসঙ্গে ডাকিতে যাও দেখিবে ঘরে ঘরে অনৈক্য। কিন্তু যে স্থানে প্রকৃত জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত, সেখানে মুমূর্ষু ব্যক্তিও সজাগ; সেও শুধু প্রাণত্যাগ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কাশীতে ছুটিয়া যাইতেছে। এই ধর্ম্মকথায়ই ভারতের কর্ম্ম-গৌরব, তীর্থস্থানগুলিতে সর্ব্বপ্রকার কায়িক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া উপবাসকৃশ সহস্র সহস্র নর-নারী কি অসামান্য অনুষ্ঠান করিতেছে! এখানে প্রীতি দেখিবে—ভারতীয় সাধুর বদনারবিন্দের সুধামধুর হাসিতে তাহা পাইবে; ভোগ-বাসনা-বিরহিত ত্যাগমহিমায় সমুজ্জ্বল, সেই হাসি অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল। এই ঐক্য, এই কর্ম্ম, এই প্রীতি জগতের অন্যত্র বিরল।

ভারতবাসী গৃহস্থ—সে আহার বিহার ভোলে নাই, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে উদাসীন। শ্মশানবাসী দেবতাকে সে পূজা করিয়া থাকে। সংসারের দিকে তাহার একটা চক্ষু আছে,—কিন্তু অপর চক্ষু শ্মশা-নের দিকে বদ্ধলক্ষ। সংসার যদি সত্য হয়,

শ্মশান তদপেক্ষা মহত্তর সত্য, এ কথা আধুনিক সভ্য জাতিরা ভুলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী রাজনৈতিক পাণ্ডা চাহে না, সে চাহে মন্ত্র। সে ক্ষণিক উত্তেজনায় মাতে না, সে আজন্ম সাধনা করিতে চাহে।

হে ভারতবাসী! তোমার ভগবান্ আবার পাঞ্চজন্য শব্দে তোমায় সেই সাধনার পথে আহ্বান করিতেছেন। যাহা ক্ষণিক, অস্থায়ী ও নশ্বর, তোমার ভগবান্ সেরূপ লক্ষ্যে তোমাকে যাইতে দিবেন না। যাহা চিরকালের জন্য সত্য, চিরসুন্দর ও অমর সেই আদর্শ তোমার চক্ষুর সম্মুখে ছিল, পুনরায় তোমার কুটিরে তাহার প্রতিষ্ঠা পাইবে।

আমি জড়-ভরতের প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন আদর্শ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যুগধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বকালের পূজনীয়– যদি লিপি-কৌশলের অভাবে আদর্শ যথাযথ চিত্রিত না হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩১৫।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ

তিন বর্ষের অধিক হইল, জড় ভরতের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান বর্ষে গ্রন্থখানি মাট্রিকিউলেসনের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় ২য় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে।

১৯ নং কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা জানুয়ারী, ১৯১২।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

তৃতীয় সংস্করণ

জড় ভরত নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় মুদ্রিত হইল। এবারও গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রাজর্ষি ভরত সংসারে বীত-রাগ হইয়া বনে চলিলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমার রাষ্ট্রভৃতের সঙ্গে তৃতীয় কুমার আবরণের সদ্ভাব ছিল না। মহিষী পঙ্কজনী জ্যেষ্ঠ কুমারের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য আবরণের সঙ্গে তাঁহারও মনান্তর ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রভৃৎ কতকটা উদার-প্রকৃতি, কিন্তু সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কার্য্য করিতেন, এদিকে আবরণ স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন, স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি জ্যেষ্ঠ কুমারের বিরক্তিকর নানাবিধ

কার্য্যে রত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুদর্শন সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও আমোদ-প্রিয়; তিনি যখন দেখিতেন, ভ্রাতৃ-বিরোধে গৃহ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তখন বংশীহস্তে একাকী মন্দানদীর তীরে যাইয়া ভৈরব-রাগ সাধনা করিতেন।

ভরত গৃহে শান্তি-স্থাপনের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমারকে তিনি অতিথিশালার ভার দিয়াছিলেন। সর্ব্বদা যথানিয়মে অতিথি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলে হৃদয়ে মহদ্ভাব ও সেবা-বৃত্তি জাগ্রত হইবে, ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের মূল এই ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই তাঁহার ধারণা ছিল।

অতিথি-শালায় রাজ-কুমারের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎস সঞ্চারিত

হইত, লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত; সামান্য ভৃত্যের কার্য্যও তিনি অনেক সময়ে নিজ হস্তে করিয়া অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। সমস্ত রাজধানীময় তাঁহার সুযশঃ প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মান অভিমান ছিল না,—অকুণ্ঠিত ভাবে তিনি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন; অথচ গৃহে আবরণের একটি কথায় তাঁহার উচ্চভাব কোথায় চলিয়া যাইত! ভ্রাতৃ-বধূ শান্তশীলা তৎসম্বন্ধে পরিজনগণের নিকট কোন প্রকার কুৎসা বা শ্লেষোক্তি করিয়াছেন এরূপ শুনিলে রাষ্ট্রভৃতের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। ধনু-র্দ্ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতৃ-বধ করিতে অগ্রসর হইতেন। আবরণও তখন উন্মত্তের ন্যায় খড়্গা-হস্ত হইয়া দাঁড়াইতেন। রাজা স্বয়ং

দুই ভ্রাতার মধ্যে পড়িয়া যেন দুইটি ক্ষুব্ধ সিংহকে পৃথক্ করিয়া দিতেন।

আবরণকে রাজা স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন। সস্নেহে তাহাকে গুরু-জনের প্রতি ভক্তির উদাহরণ-স্বরূপ পূজ্যপাদ মহাপুরুষগণের কাহিনী শুনাইতেন। স্ত্রীবুদ্ধিতে যে অনেক সময় গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনাইতেন। বুদ্ধিমান্ পুত্রের এই সকল ইতিহাসের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কোনই বিলম্ব দেখা যাইত না। রাজা ভাবিতেন, সুবুদ্ধি পুত্রের এইবার চরিত্রের সংশোধন না হইয়া যায় না; কিন্তু মাতাকে দেখামাত্র অনেক সময় অসহ্য বিরক্তিতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইত এবং শান্তশীলার নিকটে গার্হস্থ্য-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত স্বরে রাজাকে

বলিতেন—“আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিন্, কোন ক্রমেই মা ও দাদার সঙ্গে একগৃহে আর থাকা হইবে না।”

রাজা মহিষী পঞ্চজনীকে তাঁহার পক্ষপাতদোষ ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিতেন,—“তোমার ন্যায় অন্যায় বোধ নাই, কি ভাবে যে তুমি রাজ্যপালন কর, তাহা আশ্চর্য্য। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যে দোষী তাহাকে দণ্ড না দিয়া তুমি সখ্য-স্থাপনে বৃথা প্রয়াস পাইতেছ।”

রাজা গৃহ-বিবাদে একান্ত বিরক্ত হইলেন। যখন তাঁহার উদ্ভাবিত সমস্ত উপায় বিফল হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদ-বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি চরিত্র সংশোধন করিতে পারে না,—

"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে"। তাহা না হইলে এই দুই বুদ্ধিমান্ পুত্র এরূপ বিসদৃশ অভিনয় করিতেছেন কেন? রাজা ভাবিতেন, যদি এই সংসারে সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী নিরীহ কাহাকেও পাইতেন, তবে তিনি ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারিতেন।

বিরক্ত হইয়া রাজা উদাসীনের মত বনে চলিলেন। পঙ্কজনী অনেক করিয়া সাধিলেন। পুত্রেরা চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। "আর বিবাদ করিবে না" বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। রাজা বলিলেন "তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু যদি তোমরা শান্তির জন্য প্রকৃতই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে তোমাদের গৃহ-সুখ অক্ষুন্ন হইবে—তাহা সর্ব্বতোভাবে

তোমাদের ইষ্টের জন্য। কিন্তু আমি আর গৃহে ফিরিব না। পক্কফল আর শাখায় থাকে না,—সংসারের সঙ্গে আমার যে বন্ধন ছিল তাহা স্বাভাবিকক্রমেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রৌঢ় বয়স অতিক্রম করিয়াছি, শাস্ত্রানুসারে বানপ্রস্থই আমার অবলম্বনীয়।”

—০—

(২)

রাজা ভরত পুলহ-ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন,—পুলহ তখন শিষ্য—ভরদ্বাজ এবং আত্রেয়ের সাহায্যে অগ্নি জ্বালিয়া হোমের উদ্যোগ করিতেছিলেন,—অদূরে অপর শিষ্য ভামহ কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতেছিল এবং শাকটায়ন গুরুদেবের হস্তে স্রুক্

প্রদান করিতেছিল, গালব একপার্শ্বে কুশ ও দর্ভাঙ্কুর সজ্জিত করিয়া কদলীপত্রের এক প্রান্তে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া রাখিতেছিল। তখন সূর্য্যদেবের অস্তোন্মুখ কিরণ এক দিকে বজ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে স্বর্ণ-কিরীট প্রদান করিতেছিল, অপর দিকে গণ্ডকীর জল রক্তিমাভ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কৃষ্ণ-বর্ণ বসনের অন্তরালে যাইতেছিল।

এমন সময় তাঁহারা সকলে দেখিতে পাইলেন, সুদীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষবর দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহার পরিধান রক্ত পট্টাম্বর,—তাহার প্রান্তভাগ স্বর্ণের কারুকার্য্যময়,—রক্ত-ক্ষৌমবাস উত্তরীয়-স্বরূপ কণ্ঠলগ্ন হইয়া কটিতে অবহেলাক্রমে আবদ্ধ, কর্ণে দুইটি হীরক-কুণ্ডল।

পুলহ মুনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে রাজা

প্রণাম করিলেন। পুলহ বলিলেন "মহারাজ ভরত, আপনার এ বেশ কেন? আপনার পরিচারকবর্গ, রথ, অশ্ব কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আপনাকে একাকী এ বেশে দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে,—আপনার কোন ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, নতুবা আপনি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, শিষ্যগণ, এই রাজ-অতিথির সম্বর্দ্ধনা কর।" তাহারা গুরুর নিয়োগানুসারে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভামহ চুপে চুপে শাকটায়নকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি সেই রাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ ভরত যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি নানা পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পৃথিবীতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন?" শাকটায়ন বলিলেন,—"শুধু

কি তাই ? ইঁহার গৃহে হোমানল কখনই নির্ব্বাপিত হয় না, শত শত ঋত্বিক্‌গণ তথায় দিবারাত্রি আহুতি প্রদানার্থ হবিঃ লইয়া ব্যস্ত থাকেন, ইহাঁর তুল্য অতিথি-সেবা জগতে কেহ জানে না,—চতুর্হোত্র-বিধিদ্বারা ইনি সর্ব্বদা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।”

কুশ, জল প্রভৃতির দ্বারা অতিথি সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তখন পুলহ শিষ্যবর্গকে বলিলেন—“ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন ; এই ভূখণ্ডের নাম পূর্ব্বে ‘অজ-নাভ’ ছিল, এই মহারাজের নাম হইতে তাহা ‘ভারতবর্ষ’ নামে পরিচিত হইয়াছে।” রাজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন ; “মহারাজের শুভাগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।”

বিনীত ভাবে ভরত বলিলেন, “মহর্ষি,

আমি আপনার আশ্রমে বাস করিয়া শিষ্য-ভাবে উপদেশ লাভ করিব, আমি আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না, আমাকে শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রদান করুন।”

মহর্ষি পুলহ্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “সে উত্তম কথা, কিন্তু আপনি এই ঋষি-জীবনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন ত?”

ভরদ্বাজ হাসিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়,—যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য করিয়াছেন, তাহা ক্ষত্রিয় নরপতিগণের গৃহ-ধর্ম্মের আদর্শ, কিন্তু নিবৃত্তিমূলক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম অতি কঠোর। রাজাদিগের পঞ্চাশোর্দ্ধে সস্ত্রীক বানপ্রস্থের ব্যবস্থা আছে,—তাহা আপনার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু মহর্ষির শিষ্যগণের ন্যায় দুশ্চর

তপস্তা এই বয়সে আপনার পক্ষে সহজ হইবে না।”

ভামহ বলিলেন—“আপনাকে বল্কল পরিতে হইবে, ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে, নিয়মিত দিনে উপবাস করিতে হইবে,—ফলমূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে, দেহকে দিনরাত্রি একটি যন্ত্রবৎ নিয়মিত করিয়া সংযম-ব্রতী করিতে হইবে,—মনের সমস্ত আক্ষেপ বিক্ষেপ দূর করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ব্রহ্মে আরোপ করিতে হইবে। কুশ, তৃণ যজ্ঞকাষ্ঠ ও হোমানল প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টায় এবং গুরু পরিচর্য্যায় হীনতম ভৃত্যের কার্য্য অভ্যাস করিতে হইবে। মহারাজ, বিরক্ত হইবেন না,—আপনি যে রাজসিক ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়াছেন,—

সাত্ত্বিক-ধর্ম্মের পথ সেরূপ নহে,—ইহা অতি দুশ্চর-তপস্যা।”

আত্রেয় বলিলেন—“আমরা শিশুকাল হইতে এই তপো-বৃত্তি অভ্যাস করিতেছি, এজন্য ইহা কতকটা সহজ সিদ্ধ হইয়াছে, আপনার যে বয়স, তাহা সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে উপযোগী নহে।”

পুলহ বলিলেন, “তোমরা কেন এই মুমুক্ষু মহাজনের তপস্যার চেষ্টায় বিঘ্ন জন্মাইতেছ?—বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সিদ্ধ-ঋষি হইয়াছেন, ইনি কেন না পারিবেন? মহারাজ, আপনি এ আশ্রমে থাকা স্থির করিয়াছেন ত?

রাজা বলিলে, “এ সম্বন্ধে আমার লক্ষ্য অটল, এখন দয়া করিয়া আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।”

৺ পুলহের নিদেশানুসারে তিনি গণ্ডকীর জলে স্বীয় রক্তবর্ণ স্বর্ণ পট্টাম্বর ও উত্তরীয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিলেন ; কর্ণের দুইটি উজ্জ্বল ও বহুমূল্য হীরক-কুণ্ডলকেও তিনি গকণ্ডীতে বিসর্জ্জন করিলেন, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবার সময় রাজার একবারও মনে হইল না যে, এই দুইটি হীরকখণ্ডের জন্য তাঁহার পিতা ঋষভদেব শতকুম্ভ নামক অসুরের সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৩)

শিষ্যগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেল,—দীনহীন বালকের ন্যায় সেই প্রৌঢ়বয়স্ক রাজচক্রবর্ত্তী ভরত সমিৎ ও কুশ হস্তে যুক্তকরে সর্ব্বদা মহর্ষির আদেশ প্রতীক্ষা করিতেন। যিনি চর্ম্মাচ্ছাদন-শোভিত হস্তিদন্তের

শুভ্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে অভ্যস্ত, তিনি কঠোর মৃত্তিকায় শুইয়া পরিমিত সময়ে সুনিদ্রা লাভ করেন। যাঁহার মহার্ঘ আহার্য্যের জন্য সুপকারগণ নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, তিনি সংযত ভাবে আনন্দসহকারে কষায় বন্য ফল মূল খাইয়া তৃপ্ত,—ঋষির আশ্রমখানি তিনি নিজ হস্তে মার্জ্জনা করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতেন,—প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উত্থানপূর্ব্বক গণ্ডকী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক পুলহের নিদেশানুসারে রেচক, পূরক, কুম্ভক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি সাধন করিতেন। ঋষির শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন; তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুণ্যজীবন সেই আশ্রমে যেন এক অভিনব প্রভাব বিস্তার করিল।

পুলহ একদিন বলিলেন,—"মহারাজ আপনার সাধনা অতি দ্রুত হইতেছে, ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ অপেক্ষাও আপনি ক্ষিপ্রতর সাধনার পথে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মণ গণের ন্যায় আজন্মসাধনা রক্ষা করিতে পারিলে আপনি এ আশ্রমকে ধন্য করিবেন,—সন্দেহ নাই।"

পুলহ দেখিলেন, ব্রহ্মানন্দ লাভের যে সকল চিহ্ন, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে রাজশিষ্যের মুখমণ্ডলে প্রকট হইয়াছে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের ভাবে সেই আনন্দ ধরা পড়িতেছে। সেই জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে যে অপূর্ব্ব বিনয় ও জীব-প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার লক্ষণ তিনি শিষ্যপ্রবরের মধ্যে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পুলহ

ভাবিলেন,—“এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে সাধনার এরূপ ফল প্রত্যক্ষ হইতে আমি দেখি নাই,—ইনি নিশ্চয়ই বহু জন্মের তপস্যা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—কিন্তু যাঁহার এতদূর পুণ্য-প্রভাব, তিনি ব্রাহ্মণকুলে যোগ-সাধনার মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলে রাজসিক ভাবের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন কেন ?”

পুলহ রাজাকে কঠিনতর ও নির্জ্জনতর যোগ-পন্থা দেখাইয়া দিলেন। ভরত সমাহিত হইয়া মহর্ষির উপদেশানুসারে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে অতি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইতে লাগিলেন—প্রতি তৃতীয় দিনে মাত্র কপিত্থ ও বদরী ফল ভক্ষণ করিতেন, কখনও

সামান্য শীর্ণ তৃণ পত্রাদির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ভগবানের সাধনা করিতেন,—তাঁহার দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল,—কেবল অন্তরাত্মা অপূর্ব্ব ভগবৎরূপ ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়া সমস্ত কুণ্ঠাত্যাগপূর্ব্বক তচ্চরণাম্বুজে লগ্ন হইয়া রহিল। কথনও তিনি দেখিতেন, সমস্ত বনফুল মাল্যের মত কাহার বিরাট দেহের-শোভা-সম্পাদন করিতেছে,—আকাশ ও পৃথিবীর স্নিগ্ধ নীলিমা সেই বরাঙ্গের জ্যোতিঃস্বরূপ নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে,—আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী বস্ত্রাভরণের ন্যায় সেই দেহের দীপ্তি সাধন করিতেছে, চন্দ্র-সূর্য্য মুকুট-মণির উজ্জ্বল শ্রী পরিয়া আছে, শ্রীপাদ হইতে করুণার ধারার ন্যায় কত গঙ্গা কল কল নিনাদ করিয়া ছুটিতেছে; পাপাসুরনাশন কত আয়ুধ হস্তে

শোভা পাইতেছে, ভক্তের অভয়চিহ্ন স্বরূপ দীপ্ত পঙ্কজ এক হস্তে ধৃত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাণী পাঞ্চজন্য শঙ্খের স্বরযোগে অম্বু-নিনাদের ন্যায় বিশ্বের কক্ষে কক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে।

সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজর্ষির চক্ষুঃ পদ্মলীন ভ্রমরের ন্যায়, ঊর্দ্ধপক্ষান্তরালে বিলীন হইত,—সমস্ত দেহে আনন্দচ্ছটা পড়িত। সেই অবস্থায় যিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, তিনি ভাবিতেন গণ্ডকীর তীরে কোন দেবতা যোগ-সাধনা করিতেছেন।

(৪)

কখনও কখনও মহিষী পঞ্চজনীর মুখখানি মনে হইত। রাজপুরীর আনন্দ-নিকেতন তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হইলে তিনি

ব্যথা বোধ করিতেন,—কিন্তু প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত পথ নিরোধ করিয়া যখন তিনি ধ্যান-পর হইতেন,—তখন সংসারের কোন ভাবনাই তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। মহারাজ ভরত সর্ব্বত্র রাজর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন, পুণ্যরত মহর্ষিগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

গালব, ভরদ্বাজ, ভামহ প্রভৃতি পুলহ-শিষ্যগণকেও স্বীকার করিতে হইল, রাজর্ষি অল্প সময়ের মধ্যে যোগ-পথে অনেকদূরে অগ্রসর হইয়াছেন।

একদিন ভামহ প্রাতঃকালে রাজর্ষি ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার তপের কোন বিঘ্ন হইতেছে কি না?

প্রসন্ন মুখে ভরত বলিলেন, "পুলহ আশ্রমের সন্নিধানে পুণ্যতোয়া গণ্ডকীর তীরে তপঃপথের অন্তরায় কি থাকিতে পারে ?"

ভামহ উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, আপনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ;—শুনিয়াছি বনবাসী হইলেও সংসারের চিন্তা হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। আপনার পরিত্যক্ত পরিজনগণের চিন্তা আপনাকে যোগ-ভ্রষ্ট করিতে পারে।"

ভরত নিশ্চিন্ত মনে হাসিয়া বলিলেন—"সে আশঙ্কা মাত্রও নাই, আমি চিত্ত-সংযম অভ্যাসপূর্ব্বক হৃদয় হইতে পরিজন-বর্গের মায়া দূর করিয়াছি,—এমন কি মহিষী পঞ্চজনী কিংবা আমার প্রিয়-পুত্র-বর্গ আমার নিকট এখন যেরূপ—জগতের

একটি সামান্য কীট পতঙ্গ ও তদ্রূপ,—আমি আর মোহের বশবর্ত্তী নহি; হৃদয়ে সমস্ত জীবের জন্য করুণা অনুভব করিতেছি।”

“একমাত্র করুণাময় ভগবানই করুণা করিতে পারেন, আমরা সকলেই করুণার পাত্র”—এই বলিয়া ভামহ চলিয়া গেলেন।

রাজা চিত্ত স্থির করিয়া তর্পণার্থ গণ্ডকীর সলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অনন্যমনা হইয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভীতিপ্রদ গর্জ্জন শব্দে রাজার যোগ ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া সেই শব্দ শুনিলেন, বুঝিলেন—গণ্ডকীর পূর্ব্বস্থিত অপর তীরের অদূরবর্ত্তী বজ্র-পর্ব্বতে সিংহ গর্জ্জন করিতেছে, সেই শব্দ স্তিমিত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় দূর হইতে গুরুগম্ভীর ভাবে শোনা যাইতেছে, রাজা উপেক্ষার সহিত

চক্ষুঃ পুনরায় নিমীলিত করিবেন, এমন সময় একটি সকরুণ দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল।

গণ্ডকীর অপর তীরে তৃণ গুল্মের মধ্যে একটী পূর্ণগর্ভা হরিণী জলপানার্থে নদীর ধারে উপস্থিত হইয়াছিল; সে সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া ভীতনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে গণ্ডকীর জলে ঝাঁপিয়া পড়িল। এই ভয় ও উল্লম্ফন-বেগে জল মধ্যেই সে প্রসব করিয়া ফেলিল, এবং করুণনেত্রে রাজার দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

রাজা দেখিলেন, সদ্যোজাত হরিণ-শিশু গণ্ডকীর তীরের নিকট ভাসিয়া যাইতেছে। অপার করুণায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল, তিনি মাতৃ-হীন হরিণশিশুকে জল

হইতে তুলিয়া আনিলেন। হোমের যে অগ্নি তাঁহার কুটীরপার্শ্বে জ্বলিতেছিল, সেই অগ্নির তাপে মৃতপ্রায় শাবকের দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল, হরিণ চক্ষুঃ মেলিয়া রাজার দিকে চাহিল, শিশু যেরূপ মাতার দিকে নির্ভরের ভাবে চাহে, মাতৃহীন হরিণ-শাবক তেমনই দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিল,—রাজার হৃদয় সেই দৃষ্টিতে বিগলিত হইয়া গেল।

তিনি ভগবানের দানস্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীবটিকে পাইয়াছেন, ইহাকে তিনি আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এখন ইহাকে বাঁচাইবেন কি প্রকারে?

রাজা শিশুটি ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখে ছুটিলেন এবং ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে

খাওয়াইলেন, অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু কমণ্ডলুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং প্রসূতী যেরূপ স্নেহের সহিত দুগ্ধের বাটী সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকেন এবং তাহা গরম করিয়া মাঝে মাঝে শিশুকে ঝিনুক দ্বারা তাহা পান করান, রাজর্ষি ভরত ঠিক তদ্রূপই করিতে লাগিলেন। হোমানলের জন্য সংগৃহীত কাষ্ঠ হরিণ-শিশুর দুগ্ধে উষ্ণতা সঞ্চারের জন্য পুনঃপুনঃ প্রজ্জ্বালিত হইতে লাগিল। প্রাতঃ-কালে ও অপরাহ্ণে রাজাকে হরিণশিশুর দুগ্ধসংগ্রহের জন্য ছুটিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময়ের অনেকাংশ সেই দুগ্ধ গরম করিয়া অতি সাবধানে তাহাকে পান করাইতে ব্যয়িত হইয়া যায়; কখনও বা তিনি সস্নেহে হরিণটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার কণ্ঠমূল ও ললাট-কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন,—শাবক

আরাম পাইয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া সেই আদর উপভোগ করিতে থাকে, কখনও বা পরম তৃপ্তির সহিত চক্ষুঃপত্র প্রসারিত করিয়া নীরবে রাজার প্রতি সৌহার্দ্দ্য জ্ঞাপন-পূর্ব্বক পুনরায় তাহা নিমীলিত করিত,— রাজা ভাবিতেন, হরিণশিশুটি অতি আশ্চর্য্য,—ইহার স্বভাব ঠিক মানব-শিশুর মত,—এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে আনন্দিত হইতেন; কখনও বা দেবকার্য্যের জন্য আহৃত কুশ ও দুর্ব্বার কোমলাংশগুলি হরিণশিশু তাহার নবোদ্গত দন্তাগ্রে ছিন্ন করিয়া আহার করিত,—রাজা কপট-ক্রোধে তাহাকে বলিতেন—"যা!—দেবতার উদ্দেশে সংগৃহীত উপকরণ উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিলি!" সে কথায় শাবক থমকিয়া দাঁড়াইত ও করুণনেত্রে রাজার দিকে

চাহিয়া থাকিত, রাজা আদরের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেন,—"ওভাবে তাকাইয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে না, যা করেছিস্ বেশ করেছিস্।"

কথনও বা রাজা দাঁড়াইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তথন হরিণশিশু স্বীয় তরুণ দন্ত দ্বারা রাজার পরিধানের বাকল টানিতে থাকিত ; রাজা ভগবানের চিন্তা ভুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং বলিতেন "তোকে এমন স্নেহ কে শিথাইল—তুই কি আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিস্ না?"

কোনও দিন দূরস্থিত শৃগাল দেখিয়া রাজা জপের মালা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি হরিণশিশুকে কোলে তুলিয়া কুটীরে রাখিয়া আসিতেন। পাছে বনের শৃগাল বা বৃক

শাবককে লইয়া যায়, এই ভয়ে রাজার রাত্রে সুনিদ্রা হইত না. তিনি রাত্রে বারং বার উঠিয়া কুটীরদ্বার ভাল করিয়া বন্ধ করিতেন,—সংগৃহীত বন-লতা যথেষ্ট শক্ত নহে, ভাবিয়া গভীর কানন হইতে সুদৃঢ় লতা আনিয়া তিনি দ্বার ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং এক দিনের সংগৃহীত লতা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া পরদিন পুনরায় বন-লতার সন্ধানে ছুটিতেন। কখনও হরিণশিশু নিদ্রা যাইত,—রাজা জপের মালায় অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে সেই নিদ্রিত শাবকের মুখমণ্ডল দেখিয়া স্নেহাতিশয্যে তাহাকে চুম্বন করিতেন। কখনও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে যাইবার সময় হরিণ-শাবককে স্কন্ধে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, গৃহে রাখিয়া

গেলে পাছে শৃগালে খাইয়া ফেলে,—এই আশঙ্কা। কখনও রাজা দেখিতেন, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে হরিণশিশু লাফাইয়া লাফাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, রাজা বারংবার মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সেই দৃশ্য-দর্শনে পরম সুখানুভব করিতেন।

(৫)

পুলহ ও পুলস্ত্য—এই দুই মহর্ষি রাজার কুটীরে উপনীত হইলেন, তখন রাজা জপ করিতেছিলেন। করাঙ্গুলী তুলসীমালার মধ্যে দ্রুতবেগে ঘুরিতেছিল,—কিন্তু রাজা ভাবিতেছিলেন,—কুটীরপার্শ্বের দর্ভাঙ্কুর সরস ও তরুণ নহে,—গত কল্য অদূরবর্ত্তী পল্লীর নিকট যে ক্ষেত্র তিনি দেখিয়াছেন, কাশকুসুমের অন্তরালে সেই ক্ষেত্রে অতি

রমণীয় দূর্ব্বা জন্মিয়াছে, হরিণশিশু সেগুলি অতি আহ্লাদসহকারে আহার করিয়াছে, আজ সেই ক্ষেত্রে উহাকে লইয়া যাইতে হইবে, তিনি স্বয়ং ক্ষেত্রের পার্শ্বে বসিয়া জপ করিবেন ও সেই দৃশ্য দেখিবেন,—ক্ষণে মনে হইতেছে, সুন্দর নধরকান্তি হরিণ-শিশুটিকে দেখিয়া বনের শৃগালগুলি ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে উঁকি মারিয়া থাকে, সেদিন তাঁহার হস্তে দণ্ড ছিল না,—একটা শৃগাল প্রায় আসিয়া হরিণের উপরে পড়িয়াছিল, আজ নিকটবর্ত্তী বনহইতে তিনি একটি সুদৃঢ় শালশাখার দণ্ড প্রস্তুত করিবেন, তাহা সর্ব্বদা ঘুরাইয়া উচ্চশব্দ করিতে থাকিবেন, শৃগালগুলি তাহা হইলে পলাইয়া যাইবে। এই সময় হরিণ-শিশুটি তাহার গাত্র-লগ্ন বাকল ঈষৎ লেহন করিতে করিতে পশ্চাৎ

ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল,—রাজা তখন পরম সুখানুভ করিতে লাগিলেন।

পুলস্ত্য ও পুলহ রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই ; তিনি জপে নিযুক্ত, কিন্তু হৃদয় হরিণশিশুটির উপর পড়িয়াছে।

পুলহ গম্ভীর-দীর্ঘস্বরে বলিলেন, "রাজন্, কি করিতেছেন! আপনি যোগভ্রষ্ট। আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন, এই আশ্রমে থাকা আর আপনার পক্ষে শোভন নহে।"

রাজা এবার ঋষিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি এই হরিণশিশুটির জীবন রক্ষা করিয়া ইহাকে আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি,—এবং নিরপরাধ, বিমাতৃক, নিরাশ্রয় জীবকে পালন করিবার

ভার লইয়াছি, ইহাই কি আপনার বিরক্তির কারণ ?

পুলহ বলিলেন,—আপনি যে মায়ার হাত এড়াইবার জন্য গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, একটা সামান্য হরিণ আপনাকে আবার সেই মায়ার চক্রে ফেলিয়াছে,—আপনি এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন্।"

রাজা বলিলেন,—"ইহা মায়া নহে, জীবে দয়া—এই দয়ার অনুশীলনে মোক্ষের বাধা হইতে পারে না। যে অবস্থায় ইহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছি, তাহা কি অন্যায় হইয়াছে ?

পুলহ বলিলেন,—"সেই ভাবে রক্ষা করিয়া আপনার ইহাকে কোন গৃহস্থের হস্তে দান করা উচিত ছিল।"

রাজার দৃষ্টি এই সময়ে স্নেহাতিশয্যে হরিণের প্রতি আবদ্ধ হইল এবং তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"তাহা হইলে আর দয়ার ক্ষেত্র কোথায় রহিল ?"

তখন পুলস্ত্য পুলহের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন; "চলুন্ আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করি,—রাজা কুতর্ক করিতেছেন, ইঁহার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিভ্রম হইয়াছে,—ভগবান্ অগ্নি-শলাকা দ্বারা পুনরায় ইঁহার চক্ষু ফুটাইবেন, আমাদের উপদেশ বা পরামর্শে ইঁহার কিছু হইবার নহে। দেখিতেছেন না, ইঁহার চক্ষু মায়াজড়িত, তাহাতে ব্রহ্মানন্দের লেশ নাই ?"

এই বলিয়া পুলস্ত্য পুলহকে তৎস্থান হইতে লইয়া গেলেন। তখন রাজা নিশ্চিন্ত মনে হস্তদ্বারা হরিণ-শিশুর গ্রীবানিম্ন কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল, —হরিণ বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাজার সেই সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু তিনি পূর্ণমাত্রায় গৃহস্থ। তাঁহার কমণ্ডলু হরিণের জলপান পাত্রে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার দণ্ড নেকড়ে ব্যাঘ্র তাড়াইবার অস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে। এখন আর সবল পুষ্টদেহ হরিণ শৃগালগণের লোভের বস্তু নহে, নেকড়ে বাঘ মধ্যে মধ্যে উহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। রাজা ভারে ভারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা হোমাগ্নির জন্য নহে। শীতকালে সেই কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালাইয়া হরিণের গাত্রে সেক প্রদান করেন। বর্ষাকালে বৃষ্টিসিক্ত হরিণের দেহ তিনি স্বীয় বল্কলদ্বারা মার্জ্জনা করেন; নব নব দূর্ব্বাঙ্কুর ও সরস দূর্ব্বা তিনি প্রচুর

পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন,—দেবার্চ্চনার জন্য নহে, কি জানি যদি বর্ষা নিবন্ধন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি হরিণকে লইয়া ক্ষেত্রে না যাইতে পারেন—তবে সেই সঞ্চিত শষ্প-লতায় হরিণের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইবে।

আর কখনও যদি হরিণ একটুকু তাহার চক্ষের আড়ালে গিয়াছে—অমনি উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন, এবং হরিণের পদশব্দ শুনিয়া আশ্বস্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক জপের মালা লইয়া গণ্ডকীর তীরে আহ্নিকে মনোনিবেশ করেন।

(৬)

এক দিন হরিণকে কুটীরে রাখিয়া গণ্ডকীতে স্নান করিতে গিয়াছেন; এমন

সময় অনেকগুলি বন্য হরিণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল,—রাজার হরিণটি চকিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ঘ্রাণ দ্বারা কি একটা আনন্দ অনুভব করিল এবং তৎ-ক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিল,—একটা বন্য হরিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে চলিয়া গেল,—রাজার আশ্রমের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, রাজা হরিণের গাত্রলগ্ন ধূলি মার্জ্জনা করিবার জন্য কমণ্ডলু ভরিয়া জল লইয়া কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন হরিণ নাই,—অমনি ব্যগ্র-ভাবে উৎকণ্ঠার সহিত চতু-র্দ্দিকে তাকাইয়া হরিণকে ডাকিতে লাগি-লেন।

নির্জ্জন আশ্রমে যেন সেই সকরুণ আহ্বানের একটা ব্যঙ্গময় প্রতিধ্বনি উঠিল। রাজার কটির বল্কল এলাইয়া পড়িল, তিনি আত্মহারা হইয়া হরিণের উদ্দেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

হিমালয়ের যে শৃঙ্গের নাম ধবলগিরি, তাহারই পাদমূল হইতে গণ্ডকী নদী ছুটিয়াছে, এবং তথা হইতে ভিন্নাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আর একটি অনতি-উচ্চ কূট গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কূটের নাম দেব-সখা —দেব-সখার গাত্র স্পর্শ করিয়া অপর দিকে ধূসর বর্ণ, বিরল-শৃঙ্গ বজ্র-পর্ব্বতের উপত্যকা-ভাগ গণ্ডকীর তীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহাতে লোধ্র ও কুন্দ কুসুমের অপর্য্যাপ্ত সম্ভার। পূর্ব্বে সুদর্শন নামক এক-শৃঙ্গ শৈল, তাহা যেন চিত্রের ন্যায় অম্বরপটে

অঙ্কিত রহিয়াছে,—এই শিলা-সমুচ্চয়ের মধ্যে প্র র বেগে গণ্ডকী বহিয়া চলিয়াছে; গণ্ডকী পর্ব্বত-দুহিতা, তাহার জল যেমন নির্ম্মল, তেমনই বেগশীল। এই নদীর তীরে উন্মত্তের ন্যায় রাজা ছুটিয়াছেন, আর ডাকিতেছেন "দেবদত্ত"।—দেবদত্ত সেই হরিণের নাম।

মাঝে মাঝে অশন পুষ্পের শাখাগ্র তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, রাজা তাহা দেবদত্তের শৃঙ্গস্পর্শ ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন,—বন্য হরিণ ছুটিয়া যাইতেছে, দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া রাজা "দেবদত্ত" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছেন—এবং যখন বুঝিতে পারিতেছেন, এ দেবদত্ত নহে, তখন আছাড় খাইয়া তরুমূলে বসিয়া পড়িতেছেন, পুনরায় পত্র-

পাতে ও তরু-কম্পন-শব্দে আশান্বিত হইয়া দেবদত্তের পদ-শব্দ ভ্রমে অনুসরণ করিতেছেন।

রাজা বিহ্বল হইয়া কহিতেছেন, "দেবদত্ত, একবার আমায় দেখা দে, আমি তোর গ্রীবা-নিম্নভাগ কণ্ডূয়ন করি, একবার দেখা দে, তোর খুরের শব্দ শুনিয়া আমি কর্ণ জুড়াই ;—আমার হস্তধৃত কোমল কিশলয় পুনরায় একবার আহার কর্, আমি তোর মুখখানি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজা মণিহারা সর্পের ন্যায় দেবদত্তকে খুঁজিতেছেন। ঐ দেখ রাজসন্ন্যাসীর গাত্র বনকণ্টকে ছিন্ন, তাহাতে রক্তবিন্দু ধূলিমাখা হইয়া রহিয়াছে,—কঠিন প্রস্তরাঘাতে পদ-

তল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষের শুষ্ক তারকা নৈরাশ্যে ক্ষিপ্ততা সূচনা করিতেছে, উদরের তল ক্ষুধায় কুঞ্চিত হইয়াছে, এবং শুষ্ক কণ্ঠে "দেবদত্ত" এই শব্দ বিকৃত হইয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হইতেছে। আর, একবার বন্য-বরাহ, একবার বন্য-মার্জ্জার, একবার কাষ্ঠ-বিড়ালীকে দূর হইতে দেখিয়া দেবদত্ত-ভ্রমে বন্ধুর বজ্র-পর্ব্বতের ক্রমোচ্চ পথে ছুটিয়া যাইতেছেন, অসাবধানতার সহিত যে প্রস্তরখণ্ড বা বন্য-লতা ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন —তাহা করমুষ্টিতে উন্মূলিত হইয়া পড়াতে, —রাজা উপত্যকার নিম্নে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, কণ্টক ও প্রস্তরখণ্ডে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, রাজার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পুনরায় গণ্ডকীর তীর ধরিয়া

কখনও উত্তরে, নৈঋ্র্তে বা ঈশান কোণে দিগ্বিদিক্-শূন্যের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছেন। এই সেই মহাভাগ রাজর্ষি ভরত,—যিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া ত্রিভুবনে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার তপস্যার একাগ্রতা দর্শনে স্বয়ং পুলহ বিস্মিত হইয়াছিলেন,—যাঁহার নামে এই মহাভূখণ্ড ভারতবর্ষ নামে পরিচিত।

অষ্টাহ উপবাস, অনিদ্রা ও এই উন্মত্ত শোকের বেগ সহ্য করিয়া বৃদ্ধ রাজা শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। নির্জ্জন বজ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় শিলাখণ্ডের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া রাজা উত্থান-শক্তি বিরহিত হইয়া পড়িলেন। যে শির পৃথিবীর দুর্লভ মাণিক্য-রাজিমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিত, যাহা স্বর্ণ-খচিত রক্তাম্বরাবৃত মহিষী পঞ্চ-

জনীর উৎসঙ্গে কোমল ব্যজন-সেবিত হইয়া নিদ্রালাভ করিত—যাহাতে একদা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উজ্জ্বল-শিখা প্রখর-রশ্মিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—যে শির একদা পুণ্য-চিন্তার নিকেতন, বিশ্বের প্রজা-মণ্ডলীর হিত-সংকল্পে ব্যস্ত, এবং উৎকৃষ্ট গন্ধনিষেবিত কুঞ্চিত কেশভারের ক্রীড়াস্থল ছিল,—সেই শির ধূলিধূসর জটাবদ্ধ কেশদামের সহিত মুমূর্ষু কালে একটা কঠিন শিলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিল—রাজা ক্ষীণকণ্ঠে, "দেবদত্ত" -বলিয়া তখনও ডাকিতেছিলেন, সে স্বর আর কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতে পারিল না,—তাহার চক্ষুতারকা আসন্নমৃত্যুতে ঊর্দ্ধগ হইয়াও দেবদত্তকে খুঁজিতেছিল—নিশ্চেষ্ট দেহ দেবদত্তের পথ-মুখে উন্মুখ হইয়াছিল—সমস্ত মনের শক্তি একত্র

করিয়া লক্ষ্য-বদ্ধ বাণের ন্যায় তিনি দেব-দত্তের চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন —অদূরে দেবদত্ত দাঁড়াইয়া করুণনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, শতবার সে দাঁড়াইয়া যেমনভাবে তাঁহাকে দেখিত, আজও সেইরূপ। শৃঙ্গ দুইটিতে বল্লতার ছিন্ন অংশ জড়িত রহিয়াছে। নিম্ন ওষ্ঠপুটের অন্তরালে ঈষৎ বিকশিত দন্তাগ্রে ভক্ষিত তৃণমূলের কিঞ্চিৎ লগ্ন রহিয়াছে, তাহার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট চর্ম্মে সূর্য্যের শেষ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে; নির্ম্মল চিত্র-পটের ন্যায় দেবদত্ত, তাঁহারই দেবদত্ত—দাঁড়াইয়া আছে। রাজা উচ্চৈঃস্বরে "দেবদত্ত" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন,—এইবার কষ্টে নামটি উচ্চারিত হইল,—সেই মুমূর্ষুর চক্ষুতারা

একবার নিমগ্ন হইয়া দেবদত্তকে দেখিয়া, লইল, বহুকষ্টে চক্ষুর প্রান্তে একবিন্দু অশ্রু উত্থিত হইল,—সেই দণ্ডায়মান হরিণের রূপ দেখিতে দেখিতে রাজার প্রাণবায়ু বাহির হইল। যে দেবদত্তকে তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত হরিণ নহে, উহা তাহার মনের সৃষ্টি। মৃত্যুকালে মনের সৃষ্টি,—ঠিক প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

(৭)

মৃগচিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া মহারাজ ভরত বজ্রপর্ব্বতের কালঞ্জর নামক শৈলে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মধারণ করিলেন।

প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা-প্রাপ্তিহেতু তাঁহার মহাভয় উপস্থিত হইল,—তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ভগবান্‌কে ভীষণ শাস্তিদাতারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে এই ভয়ের ভাব দূরীভূত হইল, তখন মৃগ-জীবনে তিনি কতকটা অভ্যস্ত হইলেন, কিন্তু গভীর বিষাদে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া রহিল।

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অবলম্বন করিয়া মৃগরূপী মহাত্মা গণ্ডকীর তীরপথে ছুটিয়া চলিলেন। শুষ্কপত্র আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করেন, কোন হিংস্র পশু-হইতে আদৌ আত্মরক্ষার চেষ্টা নাই,—

কেবল যখন সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল গণ্ডকী নদীর জল পান করেন,—তখন তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হয়,—এই নদীর জলে দাঁড়াইয়া এজন্মে আর তাঁহার তর্পণপূর্ব্বক ভগবৎ আরাধনা করার অধিকার নাই।

কিছু দিন পরে তিনি পুল্যস্ত-পুলহ আশ্রমে হরিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মৃগরূপী ভরত গণ্ডকীর তীরে স্বীয় পরিত্যক্ত কুটীর চিনিয়া লইলেন ও একদা যে কুশাসনে বসিয়া, যে জপের মালা ধারণ করিয়া তিনি ভগবৎ-চিন্তা করিয়াছেন—তাহা সাশ্রুনেত্রে দেখিয়া কুটীরদ্বারের ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

যে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ তিনি একবার পাইয়াছিলেন—এজন্মে আর তাঁহার সে

অধিকার নাই। তিনি কাঞ্চন ভুলিয়া কাচে মজিয়াছিলেন, তাই হরিণ সাজিয়াছেন—মানুষ হইয়া মানবের সার ধন ব্রহ্ম-জ্ঞান তিনি স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—তাই সেই পরম অধিকার হইতে তিনি এবার বঞ্চিত।

মৃগ-রূপী ভরত পুলহ ঋষির কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঋষিশিষ্যগণকে হোমানল জ্বালিতে দেখেন, তাঁহারা যখন প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হন—তখন মৃগ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সেই যোগিগণের রূপসুধা পান করিতে থাকেন, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হয়। পুলহ ঋষিকে তিনি দেখিতে সাহসী হন না,—ইনি পরম অনুকম্পায় তাঁহাকে মোহ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইয়া

ছিলেন—রাজা ইঁহার স্বর্গতুল্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মায়ায় জড়িত হইয়াছিলেন।

মৃগ সেই পুলস্ত্য-আশ্রমের এক কোণে পড়িয়া থাকিত সে কিছু খাইতে চাহিত না, ঋষিশিষ্যগণ দয়া করিয়া তাহার সম্মুখে যাহা ফেলিয়া দিত, তাহাই কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণধারণ করিত, সে বুঝিল যে, এই জীবন তাঁহার দণ্ডভোগের কাল; সুতরাং ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সুখে বীতরাগ হইয়া সে দণ্ডের শেষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কখনও গালব তাহাকে তৃণ দূর্ব্বা হাতে করিয়া খাওয়াইতেন, মৃগ ঋষি-কুমারের পবিত্র হস্তস্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা খাইত, তখন তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে থাকিত।

একদা গালব নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছিলেন ;—

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্॥
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ॥
অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ত্ততে।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্॥
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তে হীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ॥
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন॥

এবং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ॥”

ভরদ্বাজ এই শ্লোক-পাঠ শুনিতেছিলেন; আর স্থির নেত্রে ভাব-বিহ্বল শ্রোতার ন্যায় মৃগ সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে চক্ষের পলকহারা হইয়া সেই শ্লোকানুবৃত্তি শুনিতেছিল। গালব বলিলেন, “এই মৃগটা অতি আশ্চর্য্য, এ যেন আমাদের সব কথা বোঝে, এরূপ মনে হয়।” ভরদ্বাজ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—“তুমি এই হরিণটার প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ যত্ন দেখাও, দেখো, যেন ভরত রাজার ন্যায় মৃগের মায়াপাশে না পড়।” গালব হাসিয়া বলিলেন, “আমিত আর ক্ষত্রিয় রাজা নই যে, প্রবৃত্তি লইয়া খেলা খেলিতে সাহসী হইব।”

মৃগরূপী ভরত এই কথা শুনিয়া দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইলেন।

শুধু পুলহ ঋষি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মৃগ পুলহের কোমলস্নিগ্ধ আঁখির ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিত যে, পরম কারুণিক ঋষি তাহার জন্য হৃদয়ে দুঃখ বোধ করিতেছেন। সে দুঃখ দয়া-জনিত ও জ্বালা-বিহীন, তাহা হৃদয়কে পবিত্র করে, কিন্তু মায়ার বশীভূত করে না। মৃগ কৃতজ্ঞতার আবেগে ঋষির পদাঙ্কে স্বীয় শৃঙ্গ ও ললাট-দেশ স্থাপন করিয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িত ও অশেষ শান্তি লাভ করিত। তাহার ভগবৎজ্ঞানের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাধুসঙ্গের অধিকার হইতে ভগবান্ এখনও তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই, ইহাই তাহার সান্ত্বনা।

যেখানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, সেই খানে মৃগ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, যেখানে আরতিকালে ঋষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেন, সেই খানে নিশ্চল চিত্রপটের ন্যায় মৃগ শ্রোতা। ক্রমে সে আর তৃণাদি মুখে গ্রহণ করে না,—তাহার দেহ কৃশ হইয়া গেল, ঋষিকুমারগণ মুখের নিকট তৃণ ধরিলে মৃগের দুই চক্ষে ধারা প্রবাহিত হয়,—সে একরূপ আহার ত্যাগ করিল। ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য তাহার আত্মা ব্যাকুল হইল; কিন্তু পশুদেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ভগবৎ সাধনা করিতে সে অসমর্থ। একদিন মৃগরূপী মহাত্মা উপবাসশীর্ণ দেহে পণ্ডকীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে সহসা তিনি হৃদয়ে ব্যথার সঙ্গে নবজন্মের আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন। পশ্চাৎ

হইতে এমন সময় কে কোমল-স্নিগ্ধ করে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিল! মৃগ সেই স্পর্শ-সুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল,—সে স্পর্শ পুলহ ঋষির। আশীর্বাণী উচ্চারণ কালে ঋষির করাঙ্গুলী ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কৃতজ্ঞ মৃগ ঋষির মুখপানে সাশ্রুনেত্র বদ্ধ করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—এবং সেই সুখ-প্রদোষকালে গণ্ডকীর তীরে দেহ রক্ষা করিল।

(৮)

দীর্ঘ—সুদীর্ঘ কালের পর আবার মনুষ্যজন্ম। মনুষ্যজন্ম কি?—উহা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর পক্ষে মুক্তির আস্বাদন,—ক্ষুদ্র সরিৎ অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে পতন,—দৈহিক সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দে পৌঁছিবার শক্তিলাভ,

—উহা প্রণব উচ্চারণের অধিকার-প্রাপ্তির শুভ কাল। অনন্ত বিমানের ন্যায়,—সীমা-হীন সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মানন্দেব অপ্রমেয় ক্ষেত্র মানুষের সম্মুখে পড়িয়া আছে। যে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া রহিল—সে তাহার জন্মের গৌরব বুঝিল না,—রাজাধিরাজের উত্তরা-ধিকারী সামান্য কুটিরবাসী হইয়া রহিল,—সে তাহার দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দিল।

এই মুক্তির অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া মহারাজ ভরত,—ইক্ষুমতীর তীরে শিবালয় নামক গ্রামে আঙ্গিরস গোত্রজাত ইন্দ্রচূড় নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এবার সাধুসঙ্গের ফল ফলিয়াছে, দীর্ঘ মৃগজন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া রাজর্ষির ব্রহ্মজ্ঞান এবার সিদ্ধ হইয়াছে।—

গাভী কিংবা ছাগ—যদি সহসা সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিত, তখন প্রস্ফুট কুসুমটি ভোজন করিবার লোভ আর তাহার হইত না ; তখন উহা তাহার চক্ষুর আনন্দসাধক হইয়া থাকিত। মহারাজ ভরত এ জন্মে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলেন, সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাসনা তাঁহারি একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। এই জগতের যথার্থ রূপ এবার তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িল। কিন্তু একবার সেই দুর্লভ জ্ঞান পাইয়া তিনি হারাইয়াছিলেন! এজন্মে যদি তাহা যায়,—ভগবানের মায়া এড়াইবার সাধ্য কোন্ পুরুষের আছে? তাঁহার কৃপাই শুধু মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অবলম্বন,—সুতরাং রাজা ভরত এবার কাহারও সঙ্গে

সম্বন্ধ রাখিয়া আর আপনাকে বিপদের সম্মুখীন করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন।

ইন্দ্রচূড়ের দুইটি স্ত্রী। প্রথমার গর্ভে আটটি পুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি ভরত দ্বিতীয়ার গর্ভজাত এই দুই সন্তানের অন্যতর। এজন্মেও তিনি বিধাতার বিধানে ভরত নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ইন্দ্রচূড় অতি নিষ্ঠাবান্ এবং শুদ্ধ-চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম ভাগবত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া সমাজে সম্মানিত। তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা কমলা দেবীও রমণীকুল-রত্ন-স্বরূপা। ইন্দ্রচূড় যত্নপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানদিগকে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ আটটি পুত্রই শাস্ত্রানুশীলনে রত এবং পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ভরত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—শিশুকালে তাঁহার মূর্ত্তি সকলের আনন্দদায়ক ছিল। যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ভগবৎজ্ঞান বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিয়া যে সকল লোক মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ তাঁহার রূপের স্নিগ্ধ আকর্ষণ দর্শকমাত্রই হৃদয়ে অনুভব করিতেন। আত্মীয়গণ সর্ব্বদা বলিতেন—ব্রাহ্মণ, তোমার এই ক্ষুদ্র শিশুটি পরম ভাগবত হইবে।

কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রচূড়ের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল। সপ্তম-বর্ষ-বয়স্ক পুত্র কথা বলিতে পারে না, ডাকিলে স্নিগ্ধ চক্ষুর্দ্বয় প্রসারিত করিয়া উদাসীনের ন্যায় চাহিয়া থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গেও খেলা করে না, কোন বিষয়ে আমোদ বা উৎসাহ নাই। যেখানে

যে লইয়া যায়, স্থাণুর ন্যায় সেই খানেই বসিয়া থাকে। ইন্দ্রচূড় তাঁহার এই প্রাণ-প্রতিম পুত্রটির শিক্ষার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। এমন সুন্দর,—উজ্জ্বল ললাট, দীপ্ত নেত্র-বিশিষ্ট সুগঠিত দেহ বালকটি হাবা হইল, এই কষ্ট পিতামাতার অসহনীয় হইয়া উঠিল। ইন্দ্রচূড় তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বহু চেষ্টা পাইলেন, বালক কিছুতেই কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কত আদরে তিনি তাহাকে মন্ত্র উচ্চারণের জন্য চেষ্টা করাইলেন, সে আদর ব্যর্থ হইল ; —তখন ক্রুদ্ধ হইয়া একদা তাহাকে প্রহার করিলেন, বালক শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কখনও কেহ

হাসি দেখে নাই, চক্ষে কেহ কথনও অশ্রু দেখে নাই;—নির্ব্বিকার জড়বৎ সমস্ত স্নেহবন্ধনের অতীত এই শিশুটির মধ্যে জড়তাসত্ত্বেও কি একটা আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ছিল, তাহাতে তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারা যাইত না। ইন্দ্রচূড় তাহার গায়ে হাত তুলিয়া অনুতাপ বোধ করিতে লাগিলেন, পিতৃনেত্র হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পতিত হইল; হাবা ছেলে সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিলেন, এবং শুধু চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা পিতার হৃদয়ে পরম শান্তির ভাব আনয়ন করিলেন।

মধ্যম পুত্র শ্রীকণ্ঠ প্রায়ই বলিতেন এই হাবা ছেলেটাকে লইয়া বাবা রাত্রি দিন ব্যয় করেন, ভগবান্ ইহাকে বাক্-শক্তি দেন নাই, এটা একটা মূক পশুর

মত, তথাপি পিতা ইহাকে কথা বলিতে শিখাইবেন, তিনি ভগবানের বিধির উপরও একটা বিধান করিতে চাহেন।” জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিকাম বলিলেন, “আমি বলিতে পারি না, কেন এই হাবা ছেলেটার জন্য আমার প্রাণেও বড় স্নেহ হয়। দিন রাত্রি ঐ হাবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ভগবান্ এমন সুরূপ ছেলেকে হাবা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাঁহার বিধান বোঝা কঠিন।”

শ্রীকণ্ঠ,—“তোমরা কেবল চেহারা দেখিয়া ভুলিয়া যাও; উহার চরিত্র অতি কুৎসিৎ, পিতামাতার আদরে ছেলেটা একবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অশুচি স্থানের জ্ঞান নাই, যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে, ধূলির মধ্যেই ত অষ্টপ্রহর কাটায়, এত বড়

ছেলে অঙ্গ-মলা মার্জ্জনা করে না, আমার মনে হয় এ সমস্তই ইচ্ছাকৃত। উহাকে আদর না করিয়া নিত্য বেত্রাঘাত করিলে ছেলেটার বুদ্ধি জন্মিতে পারে।”

মুক্তিকাম বলিলেন, “ও কথা ব’ল না, এমন নিরপরাধ শিশুকেও ব্যথা দিতে হয়!”

(৯)

ইন্দ্রচূড় কিছুতেই উহাকে শিক্ষা দেওয়ার আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি ক্রমাগত তদ্বিষয়ে চেষ্টিত রহিলেন। বাক্-হীনের বাক্যস্ফূর্ত্তির জন্য দিবারাত্রি চেষ্টা চলিতে লাগিল, এই চেষ্টার মধ্যে একদিন ইন্দ্রচূড়ের উপর জীবের অপরিহার্য্য শেষ আহ্বান আসিল, তিনি দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন, কনিষ্ঠা জায়া কমলা

সপত্নীর হস্তে স্বীয় পুত্র ও কন্যাকে অর্পণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিলেন।

যখন কমলাদেবী চিতানলে দগ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার কন্যা অরুন্ধতী, সপত্নী লক্ষ্মীদেবী, এবং আটপুত্র, বিলাপ শব্দে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ভরতকে সেখানে আনা হইয়াছিল, এই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে দশমবর্ষীয় বালক ভরত নির্ব্বিকার!—তাঁহার মূর্ত্তি একটু গম্ভীরতর হইয়াছিল এই মাত্র। সমুদ্রে পতিত মনুষ্য ও সমুদ্র-তীরে উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত ব্যক্তির যে প্রভেদ, তাঁহার সঙ্গে অপরের সেই প্রভেদ দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও অনিত্য বস্তুর ধ্বংসের বিকার-রহিতত্ব, এই দুইটি ভাব সুস্পষ্ট জাগ্রত ছিল, তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই

ভাব বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বৃথা প্রাজ্ঞমানী ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ এই বিলাপের মধ্যেও ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "এ হাবা ছেলেটার ভাব দেখিলে কষ্ট হয়। পশুকে ভগবান্ যে জ্ঞান দিয়াছেন, ইহাকে কি তাহাও দেন :নাই!"—এই সময় চিতায় উঠিবার পূর্ব্বে সিন্দূরের কৌটাহস্তে কমলা দেবী ভরতের কর ধরিয়া লক্ষ্মীদেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "দিদি, এই বালককে দেখো, তোমরা জান না, তোমাদিগকে বলি নাই, এই বালককে দেখিয়া আমি এই জীবনের সকল কষ্ট ভুলিতাম, আমার সাংসারিক সমস্ত দুঃশ্চিন্তা, শোক ও দুঃখের মধ্যে যখন এই বালক আমার অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইত, তখন আমার সুখ দুঃখের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিত, একটা আনন্দের ভাব মনে

উপস্থিত হইত, তাহা পুত্রস্নেহজাত নহে। ইহাকে আমি কখনই পুত্র বলিয়া জানি নাই। আমার এখনও ইহার নির্ব্বিকারমূর্ত্তি দেখিয়া দৈহিক সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার চিতার নিকট ইহাকে ধরিয়া রাখিও। যে পর্য্যন্ত চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাকে এইখানে রাখিও। আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহাকে দেখিয়া লইব। আর, দিদি, এ মাতৃহীন হাবা ছেলেকে তুমি ক্ষুধার সময় খাইতে দিও। ক্ষুধা হইলে হাবা খাইতে চাহে না।—দিদি, তুমি উহার উদর-তলের কুঞ্চন দেখিয়া খাইতে দিও। আমি অরুন্ধতীর জন্য ভাবি না। আমার আর আট পুত্রও বড় হইয়াছে, দিদি সকলে মিলিয়া আমার হাবা ভরতকে রক্ষা করিও।" এই

কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী সাশ্রুনেত্রে ভরতকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন এবং কিছু না বলিয়া তাহার শিরে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জনকজননী এক চিতায় দগ্ধ হইয়া গেলেন। হাহাকার করিয়া পুত্র, কন্যা ও মাতা লক্ষ্মীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

(১০)

পিতার ন্যায় মুক্তিকাম হাবা ভরতকে চক্ষে চক্ষে রাখেন, মাতা লক্ষ্মীও হাবাকে আগে খাওয়াইয়া তৎপর অপর সন্তানদিগকে আহার্য্য প্রদান করেন। হাবা ছেলে সেই গৃহে সকলের চক্ষুর তারার ন্যায় হইল। মৃত পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের জন্য যে নিরুদ্ধ স্নেহ তাহা

সমস্ত ভরতের উপর আরোপপূর্ব্বক সেই গৃহে সকলে তাহাকে প্রাণপ্রতিম বলিয়া জ্ঞান করিল। কিন্তু সেই স্নেহের বন্ধনে সে ধরা দিল না। পাষাণের উপর জলবিন্দু পতনের ন্যায় তাহার প্রতি প্রদত্ত এই প্রীতি হৃদয়ে কোন স্থায়িভাব অঙ্কিত করিল না।

মধ্যে মধ্যে শ্রীকণ্ঠ ভরতকে ভৎর্সনা করেন, তখন আর সকল ভ্রাতা তাঁহাকে দমন করেন এবং মাতা লক্ষ্মীদেবী সে দিন শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে রাগে কথা বলেন না। এই ভাবে এক বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করিলেন। অরুন্ধতীর পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল, এইবার তিনি স্বামিগৃহে চলিয়া গেলেন।

আট ভ্রাতা পৃথক্ হইয়া যজন-যাজন

কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা হইল যে, হাবা এক এক দিন এক এক জনের বাড়ীতে খাইবে।

ভরতের প্রতি এখন আর সে মনোযোগ নাই। সে রাস্তায় যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে, রৌদ্র বৃষ্টি তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ নাই। রাস্তায় তাঁহাকে যে ডাকে, তিনি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যান। বহিরিন্দ্রিয়নিরোধ এবং যোগসাধনের ফলে তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ হইয়াছে, তিনি হস্তিশাবকের ন্যায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন দিন একটা মোটবহনে নিযুক্ত করে, তিনি নীরব

বিনা আপত্তিতে তাহা মাথায় করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন,—সেই ব্যক্তি পুরস্কার স্বরূপ কিছু খাইতে দিলে তিনি সেইখানে তাহা আহার করেন। কিছু না দিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধারপূর্ব্বক দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেও ক্ষুণ্ণ না হইয়া তিনি সেস্থান ত্যাগ করেন। যে তাঁহাকে যাহা বলে তাহাই ভরত ভগবানের আদেশ মনে করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লন। কারণ এজগতে তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি করেন না। কোন দিন কোন মাঝি লোক না পাইয়া তাঁহাকে লইয়া যায়,—তিনি তাহার নিয়োগে সারাদিন বৈঠা চালাইয়া, লগি ঠেলিয়া নৌকা বাহিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে মাঝি বিদায় করিয়া দেয়,—ক্ষুৎপিপাসা-জ্ঞান-বিরহিত ভ্রাতাকে

মুক্তিকাম খুঁজিতে খুঁজিতে নদীতীরে পাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন, তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না,—সেদিন কিছুই খাওয়া হয় নাই, অথচ মুখ-মণ্ডল সদানন্দময়। কে তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা শতবার প্রশ্ন করিলেও ভরতের মুখে কোন উত্তর নাই। মুক্তিকাম ও অপরাপর ভ্রাতারা তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন! যজন যাজন কার্য্যো-পলক্ষে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে থাকিতে হয়,—কে এরূপ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিবে?

ক্রমেই ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার প্রতি একটু উদাসীন হইয়া পড়িলেন। কতকাল গৃহস্থের পক্ষে এ ভাবে জড়বৎ ব্যক্তিকে পালন

করিবার সুবিধা হয়! ভরত এখন গৃহে না আসিলেও আর কেহ ব্যস্ত হন না,—ভরতকে ধরিয়া কেহ তাহার গৃহের দাওয়ার জন্য মৃত্তিকা কাটাইতেছে। সে কাহারও কাষ্ঠ কাটিতেছে, সারাদিন এই ভাবে পরিশ্রম করার পর কেহ কিছু দিলে সে খাইল—না দিলে উপবাসী পড়িয়া রহিল। কোন দিন বৃক্ষমূলে, কোন দিন ভ্রাতৃগৃহে, কোন দিন বা কোন ব্যক্তির নিয়োগানুসারে গৃহপাহারায় সে রজনী কাটাইতে লাগিল,—প্রত্যেক ব্যক্তির কথা ভরত ভগবদ্বাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেন, এই অসামান্য শ্রম মনুষ্যের পরিচর্য্যা-বৃত্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার চিত্তে উজ্জ্বল হইয়াছিল, সুতরাং তিনি হৃষ্টচিত্তে এ সমস্ত কাজ করিতেন।

(১১)

একদা শ্রীকণ্ঠ বলিলেন, হাবাটা পৃথিবীশুদ্ধ লোকের জন্য খাটিয়া মরে, আমাদের ক্ষেত্রের কাজ উহাকে দিয়া করাইলে হয়,—সমস্ত ভ্রাতাই এই কথার অনুমোদন করিলেন; তখন তাঁহাদের নিয়োগানুসারে ভরত ক্ষেত্রের আইল বাঁধিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভরত আইল বাঁধিতে বাঁধিতে দেখিলেন, কতকগুলি পিপীলিকা ক্ষেত্রের জলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য অপরদিকে যাইবার পথ পাইতেছে না,—তখন তিনি আইলের বাঁধ খুলিয়া দিলেন,—নিজের বাঁধা অংশের সঙ্গে ভ্রাতাদের বাঁধা অংশও মুক্ত করিয়া দিলেন; আবদ্ধ জল নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া গেল,—এই অবস্থায় শ্রীকণ্ঠ আসিয়া

দেখিলেন, হাবা সর্ব্বনাশ করিয়াছে ; তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন,—হাবা গ্রাহ্য না করিয়া সেই প্রহার সহ্য করিতে লাগিলেন,—তাহাতে শ্রীকণ্ঠের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল, তিনি নিকটবর্ত্তী একটি ভূপতিত কঞ্চী হাতে লইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত প্রহার করিতে লাগিলেন, ভরতের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় মুক্তিকাম আসিয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীকণ্ঠের হস্ত হইতে কঞ্চী কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একটা বিষম দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিবারিত করিলেন। তখন অধোবদনে মুক্তিকাম সেইখানে বসিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন, কমলাদেবী এক হস্তে সিন্দুরের কৌটা অপর হস্তে এই বালকের করধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মাতা লক্ষ্মী-দেবীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মনে পড়িল, তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবী যে তখন উহাকে বাহুতে জড়াইয়া মস্তকো-পরি অশ্রু-বিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দৃশ্য মনে পড়িল। পিতা যে ইহাকে চক্ষের তারার ন্যায়, কণ্ঠের হারের ন্যায় প্রিয়তম জ্ঞানে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখি-তেন—সে কথা মনে পড়িল। তখন সাশ্রুনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে,—দেহ কর্দ্দমাক্ত, একটা ইষ্টকাঘাতে পদতল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহা হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছে, তথাপি সদানন্দ কনিষ্ঠ

ভ্রাতা এ সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া বসিয়া বসিয়া যেন প্রহারের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার চক্ষে তথনও একটা আনন্দের ভাব জাগিয়া আছে।—তিনি আর থাকিতে পারিলেন না,—স্ত্রীলোকের ন্যায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া জড় ভরতের গলা জড়াইয়া ধরিলেন, ও তাহাকে আর কাহারও হস্তে দিবেন না, নিজ বাড়ীতে রাখিবেন,—বারংবার এই শপথ গ্রহণপূর্ব্বক আদরে উঠাইয়া বাড়ীতে আনিলেন এবং অতি স্নেহের সহিত স্বহস্তে ক্ষতস্থানে ঔষধ বাটিয়া দিলেন। কিন্তু ভরত প্রীতি ও বিদ্বেষে তুল্য উদাসীন ভাব দেখাইয়া ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মুক্তিকামের গৃহিণী অনসূয়া সঙ্কীর্ণ-চেতা রমণী ছিলেন; তাঁহার তিন বর্ষ-

বয়স্ক একটি পুত্র ছিল, এই পুত্রটিকে ভরত অনেক সময় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, এই ভরসায় তিনি ভরতের আগমনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন না। মুক্তিকাম প্রত্যূষে উঠিয়া স্বীয় কার্য্যে গমন করিতেন, দ্বিপ্রহরান্তে গৃহে আসিয়া স্নানাহ্নিক ও ভোজন ব্যাপার সমাধা করিয়া পুনরায় বহির্গত হইতেন এবং রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন, সুতরাং প্রায় সমস্ত দিন তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূরে থাকিতে হইত। তিনি স্ত্রীকে আদেশ করিয়া যাইতেন যেন ভরতের আহারাদির যথা সময়ে ব্যবস্থা হয়,—সে নিজে খাইতে চায় না, তাহাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া খাওয়াইতে হইবে। গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "ভরত ত খাইয়াছে, সে ত ভাল

আছে ?” যদি কোন খাওয়ার ভাল দ্রব্য পাইতেন, তবে গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিতেন, “আগে ভরতকে দিবে, তৎপর সিতিকণ্ঠকে দিবে”—সিতিকণ্ঠ তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র।

স্বামী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে অনসূয়া ভরতকে ডাকিয়া বলিলেন, “হাবা, সিতিকে কাঁধে করিয়া খেলা দে।” হাবা সিতিকে কাঁধে করিয়া লইয়া হাটিতে লাগিল,—কিছুকাল পর্য্যটন করিতে করিতে একটি দেবালয় দর্শনে ভরতের ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইল,—তখন সমস্ত দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল,—সিতিকণ্ঠ তাঁহার কাঁধ হইতে একটা নর্দ্দমার নীচে পড়িয়া আঘাত পাইল,—সে সংবাদ পাইয়া অনসূয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ছেলেকে সান্ত্বনা ও

শুশ্রূষাদি করিয়া উঠাইয়া লইলেন, তিনি ভরতকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ভয়ে একথা স্বামীকে বলিলেন না। কারণ স্বামীর স্পষ্ট আদেশ ছিল, "হাবাকে কোন কার্য্যের ভার দিও না, উহাকে দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় যত্নে পালন করিও।"

কিন্তু সেই দিন হইতে অনসূয়া বুঝিলেন,—ইহার হস্তে ছেলেরক্ষার ভার সমর্পণ করা নিরাপদ নহে। তখন জড় ভরতকে তাঁহার একান্ত একটা গলগ্রহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তদবধি তাঁহার আহার সম্বন্ধে তিনি একান্ত উদাসীন হইলেন, সামান্য শাকান্ন বেলা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন,—কোন দিন তাহাও পরিমাণে অতি অল্প হইত, কিন্তু জড়

ভরত পূর্ব্ববৎ সদানন্দময়। আদরেও সে যেরূপ ছিল, অনাদরেও ঠিক তাহাই রহিল। সামান্য নদীতে বর্ষা গ্রীষ্ম ঋতুভেদে অবস্থায় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—কিন্তু মহাম্বুধি কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল ঋতুতেই সমান।

মুক্তিকামের গৃহে একটা কাঁটাল গাছ ছিল, সেই পল্লীতে সে কাঁটালের তুল্য উৎকৃষ্ট কাঁটাল কোন গাছে ফলিত না,—এবার সেই গাছের নিম্নডালে প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া একটা খুব বড় কাঁটাল ফলিয়াছিল,—অনসূয়া তাহা সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। আর ৩।৪ দিনের মধ্যে তাহা পাকিবে। একদা ভরত সেই বৃক্ষের অনতিদূরে কুটীরের দাওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলেন, গৃহে একখানি খট্টার মধ্যে সিতিকণ্ঠ ঘুমাইতেছে,—অনসূয়া একটা বিশেষ

কার্য্যের তাড়ায় নিকটবর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে গিয়াছেন, এমন সময় দুইটি শৃগাল উপস্থিত হইয়া একটি দন্তাগ্রে কাঁটালটির বোঁটা কাটিয়া ফেলিল,—এবং তৎপর উভয়ে দন্ত দ্বারা ছিন্নবৃন্ত ধারণপূর্ব্বক টানাটানি করিয়া কাঁটালটিকে বনের দিকে লইয়া গেল,—বলা বাহুল্য শৃগালদ্বয়ের আগমনাবধি সকল ব্যাপারই ভরত দর্শন করিতেছিলেন,—তিনি সামান্য একটু চেষ্টা করিলে কিংবা শুধু উঠিয়া দাঁড়াইলেই শৃগালদ্বয় ভঙ্গে পলাইয়া যাইত, কিন্তু জীবের খাদ্যের ব্যাঘাত তিনি করিবেন না,—সুতরাং তিনি কিছুই করেন নাই। এদিকে কাঁটাল শৃগালে লইয়া গেল—এই ধ্বনিতে অনসূয়া তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন, এবং এতদিনের আশা এইভাবে নষ্ট হইল

দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া রুদ্র-মূর্ত্তিতে আগমনপূর্ব্বক ভরতের গণ্ডে দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। ভরত তাহাতে কোন বিরক্তি বা দুঃখের ভাব প্রকাশ করিলেন না।

অনসূয়া বুঝিলেন, কাঁটাল যে ভাবে গিয়াছে—নিদ্রিত শিশুটিও সেইভাবে যাইতে পারিত, জড়ভরতের দ্বারা কোন কার্য্যই হইবার নহে। এখন হইতে কথায় কথায় জড়ভরতের গণ্ডে চপেটাঘাত পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার খাদ্যাদির ব্যবস্থা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইতে চলিল।

পাছে লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, পূর্ব্ববৎ পতন ঘটে, এই আশঙ্কায় ভরত মূক ও বধিরের মত ছিলেন—নিজ আত্মা ভগবানের পাদমূলে

বিকাইয়া তিনি পরম স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া—জড়বৎ লোক নিগ্রহের পাত্র হইয়া রহিলেন।

(১২)

একদা মুক্তিকাম কার্য্যোপলক্ষে ৩।৪ দিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন; তাঁহার ক্ষেত্রের ধান্যগুলি প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে, এ অবস্থায় সেগুলি রাত্রে আসিয়া কেহ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় অনসূয়া হাবাকে বলিলেন, "ক্ষেত্রের পার্শ্বে যে মঞ্চ আছে, তাহাতে যদি রাত্রি বঞ্চন করিতে পার, তবে চোর আসিবে না,— তুমি ত কত রাত্রি গাছতলায় কাটাইয়া দাও, নিজদের কাজ কি একটুও করিবে না!" বধূ ঠাকুরাণী ভাবিলেন, কিছু

করুক আর না করুক, তাহার আদেশানু-সারে হাবা নিশ্চয়ই মঞ্চোপরি বসিয়া থাকিবে, তাহাকে দেখিলে চোর আসিতে সাহসী হইবে না। হাবা হৃষ্টচিত্তে সেই মঞ্চোপরি বসিয়া রহিল, বলা বাহুল্য লোকালয় হইতে দূরে নিভৃত স্থানে রাত্রি-যাপনই তাঁহার ভগবৎ আরাধনার বেশী উপযোগী ছিল।

সে রাত্রি অমাবস্যার রাত্রি,—ভরত স্থির হইয়া ক্ষেত্রপার্শ্বস্থিত মঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, ক্ষেত্র হইতে অদূরে প্রবাহিত খরস্রোতা 'রক্তাম্বরা' নদীর বাতাঘাত-চূর্ণ-তরঙ্গ শব্দ কর্ণে আসিতেছে, আকাশের নক্ষত্রগুলি রক্ত-চক্ষুর ন্যায় দীপ্যমান, সম্মুখস্থ রতনপুর-পল্লী যেন অব-গুণ্ঠনবতী হইয়া নীলাম্বরের সঙ্গে মিশিয়া

গিয়াছে। ভরত, মৌনভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিয়া ধ্যানপর হইয়া আছেন।

এমন সময় দস্যুপতি রুদ্রসহায়ের চরগণ কোলাহল করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দস্যুপতি পুত্রলাভ কামনায় একটি নরবলি মানসিক করিয়াছিলেন,—একটি দুর্ভাগ্যকে এতদর্থে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগক্রমে পলাইয়া যায়; রুদ্রসহায়ের চরগণ সেই লোকটিকে খুঁজিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে অনেক মশাল প্রজ্বলিত ছিল, সেই আলোকে তৎস্থানের অন্ধকার দূর হইয়াছিল এবং অমানিশা সূর্য্যালোকিত দিবসের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহারা সেই ক্ষেত্রের নিকট যাইবার সময় দেখিতে পাইল, মঞ্চোপরি একটি

লোক বসিয়া আছে. তাঁহার কটিবিলম্বিত পরিধেয় অতি মলিন, মাথার চূল জটায় পরিণত হইয়াছে, দেহ ধূলি-ধূসর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে ?" জড় ভরত কোন উত্তর করিল না; একজন বলিল "তুই আমাদের সঙ্গে চল,"—অমনই জড়-ভরত ঈশ্বরাদেশ মনে করিয়া সেই দলের সঙ্গে চলিল। যে ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে চুপে চুপে সহচরগণকে বলিল, "ইহার দেহখানি বেশ পুষ্ট। সুগঠিত দেহ এবং বর্ণ খুব উজ্জ্বল, ধূলি-মলিন হইয়াছে। যে পলাইয়া গিয়াছে এ ব্যক্তি তাহার স্থান পূরণ করিতে পারিবে।" সহচরগণ সকলেই তাহার কথার অনুমোদন করিল। জড় ভরতকে তাহারা ধরিয়া লইয়া চলিল।

বনমধ্যে পূজা হইতেছিল। একটি জীর্ণ

মন্দিরের ইষ্টক ধসিয়া তদুপরি অশ্বত্থবৃক্ষ উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে মন্দিরচূড়ার স্খলিত আস্তরের মধ্যে সেই বৃক্ষের মূল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেই মূলে যেন মন্দিরটি নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে ;—অদূরে একটি পুরাতন পুষ্করিণী, তাহা শৈবালপূর্ণ ; তাহার এক কোণ হইতে একটি নরকঙ্কালের অংশ দেখা যাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্বে একটা ভগ্ন অতি পুরাতন প্রাচীর ।

এই প্রাচীরের পার্শ্বে দস্যুপতি রুদ্র-সহায় বসিয়াছিল, পুরোহিত তাহার কপালে রক্তচন্দনের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক পরাইয়া দিয়াছিল। তাহার পরিধান রক্ত পট্টাম্বর, এবং গলদেশে লম্বিত দীর্ঘ জবামাল,—চতুর্দ্দিকে দস্যুগণ শঙ্খ, ঘণ্টা ও নানাপ্রকার

বাম্ব বাজাইতেছিল,—ধূপাচ্ছন্ন হইয়া মন্দি-রের মধ্যে পুরোহিত-করধৃত পঞ্চপ্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল—তাহাতে বিনাশ-শক্তিরূপিণী কালীমূর্ত্তির বরভয়প্রদ হস্তখানি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। বিনাশ করি-য়াও তিনি রক্ষা করেন, করসঙ্কেতে স্পষ্ট-রূপে এই আশ্বাস যেন সূচিত হইতেছিল। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে এক একবার মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন—"বলি পাওয়া যায় নাই?" রুদ্র-সহায় উত্তর করিল—"এখনও তাহারা ফিরিল না, বড় আশ্চর্য্য! আমি শিউ-নারায়ণকে বলিয়া দিয়াছি, যদি একান্ত পক্ষে তাহাকে না পাওয়া যায়, তবে কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে চুরি করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসে। সুতরাং তাহারা একজনকে না

আনিয়া ছাড়িবে না ; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া মন্ত্রপাঠ করুন।”

এমন সময়ে জড় ভরতকে লইয়া অনুচরবর্গ উপস্থিত হইল। দস্যুগণ দূর হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘সংবাদ কি ?’ শিউনারায়ণ বলিল ‘সংবাদ ভাল, কিন্তু সেটাকে পাওয়া যায় নাই।’

তখন জয়ঢাকের বাদ্য আরও উচ্চে উঠিল। মন্দিরা, ঘণ্টা ও শঙ্খ একত্র বাজিয়া উঠিল এবং আসবপানে উন্মত্ত দস্যুগণ জবাফুলের মালা পরিয়া নৃত্য করিতে করিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল— পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হস্তে লইয়া দেবীকে আরতি করিতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখোচ্চারিত মন্ত্র বজ্র-গম্ভীররবে নিনাদিত হইতে লাগিল।

দস্যুরা জড় ভরতকে স্নান করাইয়া আনিল। জড় ভরত নিজের অবস্থা বুঝিলেন,—তিনি নিবিষ্টভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট দেহ অথচ ধৈর্য্য সহকারে শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র বিকৃতভাব উপলব্ধ হইল না। বিধিমতে স্নানান্তে তাঁহাকে দস্যুরা রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক চণ্ডিকাগৃহে লইয়া গেল। অবশেষে ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নবীনপত্রের অঙ্কুর ও ফল উপহার দিয়া পুরোহিত তাঁহাকে কালীর নিকট নিবেদন করিলেন।

আবার অট্টরোলে জয়ঢাক, শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। দস্যুগণের ধেই ধেই নৃত্যে ও পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে সেই মন্দির অতি ভয়াবহ ভাব পরিগ্রহ করিল।

গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারভূষিত দেহ ক্ষৌমবাসপরিহিত ভরত যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত হইলেন। তাঁহার কপালে দস্যুরা তিলক পরাইয়া দিয়াছিল। এই অপূর্ব্ববেশে ভরত সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার-স্বরূপ শোভা পাইলেন। যিনি জীবনে কাহাকে বিদ্বেষ করেন নাই, শত অত্যাচারেও যিনি কথনও অভিযোগ করেন নাই, যিনি সামান্ত পিপীলিকাকে রক্ষা করিবার জন্ত ভ্রাতৃ-হস্তে ভয়ানক প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন,—যাঁহারা তাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদের আহ্বানও যিনি ভগবানের আহ্বানের ন্তায় গণ্য করিয়াছেন,—যিনি জীবনে কাহাকেও ব্যথা দেন নাই, উৎকট পরিচর্য্যাবৃত্তি দ্বারা নির্ব্বিচারে সকলের সেবা করিয়াছেন—সেই

ভগবদ্‌ভক্তির অবতার স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরম সৌম্যমূর্ত্তি ভরতের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দস্যুরা যূপকাষ্ঠে গ্রীবা বদ্ধ করিবে, এমন সময়ে অমানিশা ভেদ করিয়া করাল কালীর লেলিহান জিহ্বার ন্যায় একটি বজ্র তথায় পতিত হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে রুদ্রসহায়কে তৎস্থানে নিহত করিল।

ধরিত্রী ধার্ম্মিক মহাত্মার এই অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন,—এবং তখনই ভূমিকম্পে সেই জীর্ণ মন্দির ভূমিসাৎ হইল। পুরোহিত সেই মন্দিরের সঙ্গে ভূপ্রোথিত হই-লেন,—যে ব্যক্তি বলি দিবার জন্য খড়্গে শান দিতেছিল সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিউনারায়ণ বলিল 'ব্রহ্মতেজ,

ভাই, ব্রহ্মতেজ,—স্নানের সময় ইহার কটিতে উপবীত দেখিয়াছি, এ যে সে ব্রাহ্মণ নহে —কোন সাধুপুরুষ।”

অপর এক দস্যু বলিল “দেখ্‌ছিস্ না, ধরিবার সময়—বাঁধিবার সময় একটা চীৎকার করিল না,—উপাধানে যেরূপ মাথা রাখে—যূপকাষ্ঠে সেই ভাবে মাথা রাখিতে গিয়াছিল।”

মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা দুইজন ভরতের বন্ধন ছাড়াইয়া দিল এবং নিজেরা ব্রহ্মশাপে নষ্ট না হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে লইয়া যাইয়া সেই মঞ্চের উপর পুনরায় রাখিয়া আসিল। কেহ পাছে কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে তাহারা পট্টবাস ও অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে মলিন বস্ত্র পরাইয়া রাখিল ও কপালের তিলক মুছিয়া ফেলিল।

তিন রাত্রি ক্রমাগত ভরত সেই মঞ্চের উপর বসিয়া ক্ষেত্রে পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত রহিল।

অনসূয়া মনে ভাবিলেন, ঠাকুরপোর দ্বারা এখন কিছু কিছু কাজ পাওয়া যাইবে। হাবাটাকে চারটা ভাত দিতে বিশেষ বিরক্তির কারণ থাকিবে না।

(১৩)

একদা সন্ধ্যাকালে ভরত ইক্ষুমতী নদীর তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিতান একখানি গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ খণ্ডিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী পুন্নাগ বৃক্ষের নিবিড় পত্ররাজিকে উজ্জ্বল করিতেছিল, জ্যোৎস্নাস্পর্শে নদীর তরঙ্গ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র জ্যোতিঃ সঞ্চার করিতেছিল। সহসা মেঘখানি চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল,

—সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুমতীর তটদ্বয়ে আঁধারের ছায়া পড়িল।

ভাদ্রমাসের মেঘ,—আবার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল, করধৃত দীপের জ্যোতিতে সুন্দরীর ন্যায় ধরিত্রী পুনশ্চ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

জড় ভরত—এই নৈশ প্রকৃতি-দৃশ্যের এক প্রান্তে নিশ্চল চিত্রের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্য-বেষ্টিত একখানি শিবিকা সেই পথে উপস্থিত হইল। অগ্রগামী সৈন্য জড়ভরতকে দেখিয়া বলিল, এই একটা বলিষ্ঠ লোক এখানে বসিয়া আছে, শিবিকা বহনে এই ব্যক্তি দক্ষ হইবে সন্দেহ নাই।'

একজন সৈন্য আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিল,—ভরত বিনা বাক্যব্যয়ে সেই

শিবিকাদণ্ড স্বীয় স্কন্ধে আরোপ করিল,—বিনা বাক্যব্যয়ে এই ভার গ্রহণ করায় সকলেই মনে করিল—শিবিকা-বহনই ইহার ব্যবসায়। বলা বাহুল্য তথায় একজন বাহকের অভাব হইয়াছিল।

এই সিবিকা সিন্ধু-সৌবীরাধিপতির,—রাজার নাম রহুগণ। বিনা ওজরে ভরত শিবিকা বহনে নিযুক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চলিবার ভঙ্গী সাধারণ মনুষ্যের মত ছিল না। পাছে পদ-পীড়নে জীবহত্যা হয় এই জন্য তিনি সতর্ক হইয়া পদক্ষেপ করিতেন। অপরাপর শিবিকা-বাহকদের সঙ্গে তাঁহার গতির সমতা রহিল না। এজন্য শিবিকা একদিকে হেলিয়া সহসা অপর দিকে উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং একবার রহুগণের মাথায় শিবিকার

ছাদের প্রান্ত ঠেকাতে তিনি আঘাত পাইলেন।

সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'শিবিকা এরূপ অসমভাবে চলিতেছে কেন?' অপরাপর শিবিকা-বাহকেরা বলিল, 'মহারাজ, নবনিযুক্ত বাহক সমভাবে চলিতেছে না।'

রাজা শিবিকা-দ্বার হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, নবনিযুক্ত ব্যক্তিটী বিশেষ রূপ বলিষ্ঠ। তখন তিনি ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন—'তোমার দেহখানি ত লৌহপিণ্ডবৎ, এই সামান্য ভারেই কি এত কাতর হইয়াছে! ভারবাহী গর্দ্দভ, অতঃপর সাবধানে শিবিকা বহিয়া যাও।"

ভরতের দেহে সুখ দুঃখ বোধ ছিল না,—মনে দেহের অভিমান ছিল না,—

সুতরাং রাজার ভৎর্সনায় কিছুমাত্র ব্যথা বোধ না করিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি পূর্ব্ববৎ অসম রহিল,—সুতরাং শিবিকা একদিকে ঝুকিয়া সহসা উঠিতে পড়িতে লাগিল।

এবার রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ভারবাহী গর্দ্দভ, নরপালের আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল এখনই পাইবি। তোর দেহ এখনই খণ্ডবিখণ্ড করা হইবে।'

এবার জড় ভরত জীবনে প্রথম বাক্য-উচ্চারণ করিলেন; বাণী স্বয়ং তাঁহার কণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি অমৃতস্নিগ্ধ কণ্ঠে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় এই ভাবের কথা বলিলেন।

'ভারবাহী আমি না তুমি? আমার দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাই, এই দেহের স্কন্ধে

একটি শিবাকার দণ্ড স্পর্শ করিয়া আছে, ইহা আমার ভার নহে।

আর তুমি নিজের পরিচয় লইয়া দেখ, পিতারূপে, পুত্ররূপে, স্বামিরূপে, বিচিত্র মায়ার ভার তোমার আত্মাকে প্রপীড়িত করিতেছে। তুমি কতকগুলি অহঙ্কারের সমষ্টির মত শিবিকায় বসিয়া আছ। তুমি অজ্ঞানের ভারবাহী, সেই ভারে তোমার স্বরূপ তোমার নিকট গূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আপনাকে নরপাল বলিয়া দর্প করিলে। পথের পথিক ধরিয়া বিনা বেতনে বেগার খাটাইয়া লও, এই ভাবে তুমি নর-পালন কর, তুমি অতি নিষ্ঠুর। আর তুমি আমার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিবে, এই ভয় দেখাইলে। এই নশ্বর মৃদ্-ভাণ্ড ভঙ্গের ভয় আমার বৃথা দেখাও, ইহার

সঙ্গে আমি অনেক পূর্ব্বেই সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছি। তুমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।'

এই ভৎসনা পবম কারুণিকের মুখ-পদ্মের সুরভি-মাখা। রাজা অপ্রত্যাশিত ভাবে এই স্নিগ্ধ উপদেশমূলক গঞ্জনা লাভ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং যুক্তকরে বলিলেন, —"আপনি কোন্ মহাজন! এমন অপূর্ব্ব উপদেশ-সুধা আমি জীবনে পান করি নাই, আমি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম, আপনি কি স্বয়ং কপিল কিংবা বৃহস্পতি! আপনাকে হীনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমি অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, —এই দীনতম সেবকের দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান

করুন। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার ব্যবহারে ও কথায় তাহা আমার বুঝিতে বাকী নাই।' জড় ভরত বলিলেন, "আত্ম-প্রতারণাপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না,—মহারাজ, তুমি বৈভবের মধ্যে বসিয়া—অহঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে না। মনুষ্যগণকে হীন মনে করিয়া—তাহাদের স্কন্ধের উপর আরূঢ় হইয়া, বেত্রহস্তে তাহাদিগকে গর্দ্দভের মত তাড়না করিতে করিতে ব্রহ্মলাভের প্রত্যাশায় কপিলাশ্রমে যাইতেছ। মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞান তোমা হইতে এখনও যতদূরে—কপিলাশ্রম হইতেও ততদূরে থাকিবে।"

রহুগণ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে কি অবস্থান্তর ঘটে তাহাই জানিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।

আমি পাপী তাপী—সেই জ্ঞানের অধিকার আমার নাই। তথাপি ভবৎসদৃশ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিয়া আমি পবিত্র হইয়াছি। আমার প্রতি সদয় হউন, আমার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। আমি আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা মত শুনিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি—কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না, এই নিমিত্ত চিত্তের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম।'

ভরত—"আপনি এ সম্বন্ধে কি কি মত শুনিয়াছেন তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।'

রহুগণ বলিলেন, "আমার সভায় পাঁচ জন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই কাহারও

নিকট পরাজয় স্বীকার করেন না। এই পাঁচজনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জটাধর, তাঁহার মতে যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ নিমর্ম্মুষ্য করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন দুষ্কর্ম্ম করিল বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তরউপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া অগ্রসর হয়—তথাপি সে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিল বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে পাপপুণ্য মানুষের কল্পনা মাত্র। আমার সভার দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম কামেশ্বর, তাঁহার মতে ধনুঃ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে অধিকতর নিকটে বা দূরে পড়ে না। সেই-রূপ জ্ঞানীই হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন,

কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্ম জন্মান্তরক্রমে স্বভাবাধীন ভাবে কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীব শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

তৃতীয় পণ্ডিতের নাম নিগ্রন্থদেব,—তাঁহার মতে সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগৎ নির্ম্মিত। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্লিপ্ত ও অবিনশ্বর—গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও আত্মা এই সপ্ত দ্রব্য। ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা চির-স্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত দ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।

চতুর্থ পণ্ডিত পুণ্যজিৎ বলেন,—আত্মা

কি জানিতে হইলে, 'রূপস্কন্ধ', 'বেদনাস্কন্ধ' 'সংস্কারস্কন্ধ' ও 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'—এই চারি ভাব উত্তীর্ণ হইতে হয়, কিন্তু কি ভাবে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার উপদেশ তিনি দেন না।

পঞ্চম সুবাহুদেব অণুবাদী। তিনি বলেন পরমাণু দ্বারাই জগতের বিকাশ। মনুষ্য-আত্মারও সূক্ষ্ম পরমাণুতেই পরিণতি লাভ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, আমি নিরন্তর এই কোলাহলময় কূটতর্কের মধ্যে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকি, এজন্য সংশয়চ্ছেদনার্থ কপিলাশ্রমে যাইতেছিলাম। জড় ভরত বলিলেন, "রাজারা সভাশোভনার্থ বিচিত্র প্রকারের পারিষদ্ রাখিয়া থাকেন, আপনিও তদ্রূপ এই পণ্ডিত পারিষদ্গণ রাখিয়াছেন,—আপনার

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা কিরূপে বুঝিবে ? কারণ তাহা হইলে আপনার সাত্ত্বিক দৈন্য উপস্থিত হইত।”

তখন সিন্ধুসৌবীরপতি রহুগণ শিরের মাণিক্য-খচিত উষ্ণীষ ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক জড় ভরতের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “মহাত্মন্,—আপনার কথা আমার কর্ণে অমৃতের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি পাপী তাপী—আমায় সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত করিবেন না” ।

ভরত বলিলেন,—“ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে যে অবস্থা ঘটে তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব !—রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য ও চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়াছিল—সে যদি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় ; কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল পরে মুক্তিলাভ করে ;

প্রহার-জর্জ্জরিত ক্রীতদাস যদি হঠাৎ একদিন স্বাধীনতা লাভ করে,—কিংবা মরুভূমি পথে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর পথিক নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইয়া দীর্ঘ ভ্রমণের পরে যদি ধনধান্যশালিনী পল্লী প্রাপ্ত হয় ;—তখন সেই সেই অবস্থান্তরজনিত যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তত্ত্বজ্ঞানজনিত আনন্দের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, আমি কি উপমায় তাহা বুঝাইব !

মহারাজ, যেরূপ কেহ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে সেই নির্ম্মল জলের ভিতর শঙ্খ, কাঁকর, প্রস্তর ও হাঙ্গর রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন—, ব্রহ্মজ্ঞানী তদ্রূপ বাসনা-তাড়িত জীবের কষ্টগুলিও সেইরূপ দেখিতে পান।

তাঁহার অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি লাভ হয়! কুম্ভকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোনরূপ ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদন্তব্যবসায়ী যেরূপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানপ্রাপ্ত মহাজন যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ মুখে বলিবার নহে। কথিত আছে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ তাহা মুখে কেহ উচ্চারণ করিতে পারে নাই, এই বলিতে বলিতে জড় ভরতের অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, চক্ষুর্দ্বয় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব প্রকটিত করিয়া উর্দ্ধগ হইল,—দক্ষিণ বাহু প্রসারিত হইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কি দিব্য সুখের ধাম দেখাইতে লাগিল,—একটি পুন্নাগ বৃক্ষ যোগি-

বরের দেহের আশ্রয় হইল। তিনি নিশ্বাসশূন্য পরমানন্দচ্ছটায় তদীয় মুখ-মণ্ডল দীপ্ত। জড় ভরত চিত্রার্পিতের ন্যায়, তাঁহার গ্রীবা হেলিয়া পড়িয়াছে, মুখে নবনীতকোমল শিশু ভাবের আভা পড়িয়াছে,—তিনি বিহ্বল ও সংজ্ঞাশূন্য। পুণ্যতোয়া নদী যেরূপ দুই কূল স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহার মুখমণ্ডলের আনন্দচ্ছটা সেইরূপ মন ও দেহ উভয়ই পবিত্র করিয়া প্রকটিত হইয়াছে। ধুলি ধূসর জীর্ণ-বাসপরিহিত, দেহ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত,—তাঁহার হৃদয়ে যেন পূর্ণশশধর উদিত হইয়াছেন,—তাঁহারই জ্যোৎস্না-কলাপ তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ জটা এবং তাঁহার মলিন গাত্র হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে; দেহ হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া সেই স্থান স্বর্গীয় কুসুম-সুরভিবাসিত করিতেছে।

রাজা এমন দৃশ্য আর দেখেন নাই,—তাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদ, তাঁহার পুত্র-কলত্র, সংসার—এই দৃশ্যের নিকট অতি তুচ্ছ। মানবজীবনের যাহা পরম সম্পদ,—সে দৃশ্য দেখিলে কি অপর কিছু ভাল লাগে? যে কহিনুর দেখিয়াছে—কাচ-খণ্ডে কি সে প্রীত হইবে?

রাজা বলিলেন, 'আমি যাহা চাহিয়াছি—তাহা পাইয়াছি—আর সংসারে ফিরিব না।' সৈন্যগণ ও শিবিকা বিদায় করিয়া রহুগণ সেই দ্বিপ্রহর নিশীথে জড় ভরতের পাদমূলে পড়িয়া রহিলেন। রাজা স্বীয় পঙ্কিল বৈষয়িক জীবন স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন, জড় ভরত তদ্রূপই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভাবাবেশে আবিষ্ট রহিলেন।

কতক্ষণ চলিয়া গেল, উভয়ে তাহা জানিলেন না। যখন পূর্ব্বাকাশের উজ্জ্বল চিত্রকর পুন্নাগতরুর ঊর্দ্ধশাখার পত্রগুলিকে ঈষৎ রঞ্জিত করিয়াছে, তখন জড় ভরতের ভাবসমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, দীনবেশে রাজা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। জড় ভরত সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা সাশ্রুনেত্রে বলিলেন,—'ভুজঙ্গদষ্ট ব্যক্তি যেরূপ মহৌষধে বাঁচিয়া উঠে, আমার দুর্নীতিবদ্ধ অহঙ্কারপুষ্ট আত্মা মহৎসংসর্গ পাইয়া আজ তেমনি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে,—এখন আমি ভবৎসঙ্গ ত্যাগ করিব না। আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী —বিমানচর মুক্ত বিহঙ্গকে দেখিয়া আমার উড়িতে ইচ্ছা হইতেছে, আমার পক্ষপুট বদ্ধ,—আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া দিন।'

ভরত বলিলেন—'মহারাজ, আপনি দীনবেশে একাকী সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করুন, সর্ব্বদা অনুসন্ধিৎসু চক্ষে নিজের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। উৎকৃষ্ট চিন্তা পোষণ করিবেন, সাধুসঙ্গ করিবেন,—এবং কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না। আমার সঙ্গে যথাসময়ে আবার আপনার দেখা হইবে।'

১৪

জড় ভরত গৃহে আসিয়া পুনশ্চ মৌন-ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। অনসূয়া বলি-লেন, 'হাবা, তুই রাত্রিকালে কোথায় থাকিস্, কিন্তু খাওয়ার সময় ঠিক হাজির হওয়া চাই,—কোন জ্ঞান নাই—কিন্তু এই জ্ঞানটি আছে! যা, হোগ্‌গে, আজ ঠাকুর পাঁচ মণ শালিধান্য পাঠাইয়া দিয়াছেন ; সে গুলি পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, শুকাতে

দিলাম,—আমি সিতিকে লইয়া মামারবাড়ী চলিলাম। আজ ঠাকুর বাড়ীতে আসিবেন না, তুই এখানে ধানগুলির কাছে ব'সে থাক্, আমি ফিরে এসে রেঁধে দেব। যদি মামা বেশী পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমাদের সেখানেই খেতে হবে, তা আমি বেলা থাক্‌তে এসে তোকে রেঁধে দিব।"

এই বলিয়া সিতিকণ্ঠকে কোলে করিয়া অনসূয়া দেবী চলিয়া গেলেন। জড় ভরত সেই ধান্যের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। এতগুলি ধান্য উঠানে ছড়ান রহিয়াছে,—বিস্তর চড়ুই পাখী সেই ধান্যের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা একবার লাফাইতে লাফাইতে একটু অগ্রসর হইতেছে,—আবার ভরতকে দেখিয়া দূরে পলাইতেছে। কিন্তু ভরত স্থাণুর ন্যায়

অটল, ক্ষুদ্র পক্ষীগুলির আহারে ব্যাঘাত জন্মাইবার তাহার কোনই প্রবৃত্তি নাই। কিছু কালের মধ্যেই পক্ষীগুলির ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে, ভরত একটা মানুষের ছবির ন্যায়,—তাঁহার দুইটি বিকাররহিত চক্ষুতে তাহারা পরম করুণা বুঝিতে পারিল, সুতরাং চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া সেই উঠানের উপর চড়িয়া ধান্য খাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ঘাড় নাড়িয়া ভরতকে দেখিতে লাগিল, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যেন 'ভয় নাই' এই বাণী সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইল,—ইহাদের মধ্যে যে গুলি অতিশয় ভীরু, তাহারা তখনও আসিতে সাহসী হয় নাই, দূর হইতে পক্ষপুট নাড়িতেছিল, এবং এক এক বার লাফাইয়া

অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাইয়া ক্ষুদ্র কোন শব্দ হইলেই চকিত হইয়া বহুদূরে পশ্চাতে হটিয়া পড়িতেছিল। ক্রমে তাহাদেরও ভয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বিশ্বের সমস্ত চড়ুই পাখী একত্র হইয়া সেই উঠান আক্রমণ করিল।

প্রায় এক প্রহর পরে নিজের এবং পুত্রের উদরতৃপ্তি করিয়া বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় অনসূয়া দেবী সিতিকণ্ঠের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন,—তিনি একটু তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলেন,—ঠাকুরপো না খাইয়া ধান্যের প্রহরা দিতেছেন, অথচ নিজে আহার করিয়াছেন,—এ জন্য একটু লজ্জিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া

গেল,—তাঁহার বাড়ী চড়ুই পাখীদের আড্ডা হইয়াছে, ধান্যগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। জড় ভরত উঠানের এক কোণে বসিয়া আছেন, বিক্ষিপ্ত ধান্যকণা তাঁহার পাদমূল হইতে খাইবার জন্য কতকগুলি পাখী তাঁহার গাত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—ভরতের দৃক্‌পাত নাই।

এই দৃশ্য অনসূয়ার অসহ্য হইল,—তিনি এক খণ্ড অসম কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক,—হাবার পৃষ্ঠে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন,—পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমাগত আঘাতের চোটে হাবা উপুড় হইয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া গেল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

এই ভাবে প্রহার করিয়া বধূ-ঠাকুরাণী, পক্ষীর ভুক্তাবশিষ্ট অর্দ্ধমণ ধান্য

তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া গৃহে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। সিতিকণ্ঠ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইল না।

যখন বেলা প্রায় উত্তীর্ণ হয়, তখন গৃহিণী ভাবিলেন, ভরতের মুখ দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয়ই বুঝিবেন, যে তাহার খাওয়া হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গের আঘাত চিহ্ন দেখিলে তিনি পাঁচ মণ ধান্যের কথা উপেক্ষা করিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইবেন। গৃহের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তাহাকে না দেওয়ার জন্য তিনি বারংবার বলিয়া দিয়াছেন, এ অবস্থায় কিছু খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহাকে কুটীরে রাখিয়া আসি। ঠাকুর আসিলে বলিব, সে খাইয়া শুইয়া আছে, আর আঘাত-চিহ্ন দেখিলে বলিব কে

মারিয়াছে কে জানে? এইরূপ মা'রত প্রায়ই খাইয়া থাকে।

কিন্তু এমন ব্যক্তিকেও খাইতে দিতে ইচ্ছা হয়! পশুকে পশুর যোগ্য আহার দান করা উচিত। এই ভাবিয়া অনসূয়া দেবী, রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের এক কোণে কতকগুলি দগ্ধ তণ্ডুল মাটীতে পড়িয়া আছে, সেইগুলি, কিছু তুষ ও পচা খইল এই তিন দ্রব্য একীকরণ পূর্ব্বক জল দিয়া সিদ্ধ করিলেন; তাহাতে এরূপ দুর্গন্ধ হইল, যে তাঁহাকে নাসিকায় বস্ত্র দিয়া রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতে হইল। এই ত্রিবিধ দ্রব্য সিদ্ধ হইয়া যাহা হইল, তাহা কোন জীবের ভক্ষ্য নহে। অনসূয়া ভাবিলেন, হাবাকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাই খায়, আজ তাঁহার বিশেষ

শাস্তির প্রয়োজন। এই খাদ্য আজ তাহাকে খাইতে হইবে। যাহা দ্বারা প্রাণ রক্ষা হয়, সেই ধান্যের উপর এত অবজ্ঞা, আজ হইতে এইরূপ খাদ্য খাইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে।

রান্না শেষ হইলে হাবার কুটীরে যাইয়া বধূঠাকুরাণী একখানি শালপত্রের উপর সেই দুর্গন্ধ অখাদ্য দ্রব্য রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। জড় ভরত তাহা খাইতে গেলেন। পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে অবিরত রক্ত পড়িতেছে, সারাদিন কিছু না খাইয়া উদর কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত দেহ ধূলি মাখা ও প্রহার চিহ্নে অসম, বেলা তখন প্রায় অতীত হইয়াছে। পরম ভাগবত জড়রূপী ভরত কুটীর মধ্যে নারায়ণকে প্রথমতঃ খাদ্য নিবেদন করা মাত্র খাদ্য অমৃতে পরিণত হইল।

সূয়া সায়ংকালে সেই স্থান মুক্ত করিতে যাইয়া দেখেন, শালপত্র স্থিত সমস্ত খাদ্য নামধেয় অখাদ্য নিঃশেষ করিয়া ভরত একটা চটের উপর বসিয়া আছেন। অনসূয়া নাকে কাপড় দিয়া সেই স্থান মুক্ত করিল এবং মনে মনে ভাবিল, হাবাটা সত্যই পশু! গরু কি ছাগেরও যে খাদ্য অভক্ষ্য—হাবা তাহা স্বচ্ছন্দ চিত্তে খাইয়া বসিয়াছে। নাকে কাপড় না দিলে তিনি বুঝিতেন, শালপত্র হইতে দিব্য পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল।

যাহা হউক, দগ্ধ তণ্ডুল ও পচা খইল যাহার খাদ্য তাহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন, বধূ ঠাকুরাণী এবার মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

দুই তিন দিন এই ঘৃণিত খাদ্য জড়-

ভরতের জন্য প্রস্তুত হইল, তাহার দুর্গন্ধ এরূপ যে প্রতিবেশিনী রমণীরা আসিয়া অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাগা তোর রান্নাঘরে এরূপ পচাগন্ধ কিসের?" অনসূয়া বলেন, "কিসের গন্ধ ভাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কোন জিনিষ হয়ত ঘরের কোন স্থানে পচিয়া আছে, আজ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিব।'

নিজেদের রান্না যত্নপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া—একটা পরিত্যক্ত উনানে সে দগ্ধ তণ্ডুল, পচা খইল ও তুষ রান্না করা হয়; গৃহের গাভীগণ খাইয়া যে খইল পরিত্যাগ করে—সেই পচা খইল, তুষ ও দগ্ধ তণ্ডুলযোগে এরূপ দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। অনসূয়ার নাসিকা ক্রমে সেই গন্ধে অভ্যস্ত হইয়া গেল। তিনি এখন রাঁধিবার সময়

আর নাসিকায় বস্ত্র প্রয়োগ করেন না,—এইরূপে একদিন উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিবার সময় আর নাসিকাপথ বন্ধ করিলেন না,—শালপত্রে কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাহা আস্তাকুড়ে ফেলিতে যাইয়া তাহাতে দিব্য পদ্মগন্ধ পাইলেন,—এ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে, চিন্তা করিয়া তিনি উচ্ছিষ্টসহ শালপত্রের ঘ্রাণ লইয়া বুঝিলেন,—এ গন্ধ সেই উচ্ছিষ্টের, তখন বিস্মিত হইলেন। হাবা এই খাদ্য রোজ রোজ কিরূপে খায়? ইহার গন্ধই বা এমন মনোহর কিসে হইল? একি আমার হস্তের স্বাভাবিক গন্ধ! যাহা হউক, হাবা ইহা কিরূপে খায় একবার দেখা আবশ্যক, এখানেত কেহ নাই,—এই মনে করিয়া অনসূয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই ভুক্তাবশিষ্ট

খাদ্যের এক কণা মুখে তুলিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইলেন,—তখন অচিরাৎ অবশিষ্ট সমস্ত খাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন, এমন অপূর্ব্ব জিনিষ তিনি পিত্রালয়ে কিংবা স্বামীর গৃহে খান নাই। একবার জালন্ধরের রাজা তথায় আগত হইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণীগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে রাজগৃহাধিষ্ঠিত দেবতার যে সকল দ্রব্যে ভোগ দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য সেই খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল,—সেই উপলক্ষেও অনসূয়া এমন সামগ্রী খান নাই।

অনসূয়া স্বামীর নিকট দ্রব্যগুণের কথা শুনিয়াছিলেন,—চূণ ও হলুদ একত্র মিশাইলে রক্তবর্ণ হয়, অথচ ঐ দুই বস্তুর কোনটিতেই রক্তবর্ণ নাই,—স্বামীর

কাছে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হ্যাদে দেখ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, চূণ ও হলুদে লালবর্ণ কোথা হইতে আসে ?" —মুক্তিকাম বলিয়াছিলেন—"উহা দ্রব্য-গুণ"। আজ অনসূয়ার মাথায় চট্ করিয়া সেই কথাটার উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন,—উহা দ্রব্যগুণ, তাঁহার হস্তের অদ্ভুত শিক্ষার গুণে,—সেই তিন অখাদ্য মিশ্রিত হইয়া এরূপ সুখাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৫

এই সত্য আবিষ্কার করিয়া অনসূয়া একবারে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, —কোন্ সময়ে স্বামী আসিবেন,—সেই আশায় ছটফট্ করিয়া একবার ঘর, আর বার বাহির হইতে লাগিলেন, উঠানে

শব্দ হইলেই অমনি বাহির হইয়া বলেন, "ওগো এসেছ নাকি ?' রাত্রির কতকাংশ অতিবাহিত হইলে মুক্তিকাম স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কাষ্ঠপাদুকা ও জল প্রদান করিলেন। ঠাকুর পদের কর্দ্দম ধৌত করিতে উদ্যত হইলে গৃহিণী বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া নিজেই স্বীয় লৌহ-শঙ্খ-ভূষিত করে ব্রাহ্মণের পদলগ্ন কর্দ্দম ধুইয়া ফেলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আজ এ অতি-ভক্তি কেন ?" অনসূয়ার বিম্বাধর হর্ষ ও গর্ব্বে ফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি কোন কথা না বলিয়া খাওয়ার স্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ নিমী-লিত চক্ষে আহ্নিকে বসিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি

স্মিতমুখে স্বামীর নিকট ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলেন "আহ্নিক শীঘ্র সেরে এস, কথা আছে।" *

অনসূয়ার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মুক্তিকাম মনে করিলেন, পত্নী নিশ্চয়ই কোন লুপ্ত ধনাগারের খোঁজ পাইয়াছেন, সুতরাং করাঙ্গুলী জপকার্য্যে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরিতে লাগিল—কোন ক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া আহার করিতে বসিলেন এবং পঞ্চদেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া বলিলেন, "বল ব্রাহ্মণী, ব্যাপারখানা কি?"

অনসূয়া বলিলেন, "সে হবে, তুমি খাইতে আরম্ভ কর।" ব্রাহ্মণ স্ত্রীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন অনসূয়া ব্যজনী হস্তে উত্তপ্ত

ব্যঞ্জনের বাটীর উপর বীজন করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমায় কাল একটা কাজ করিতে হইবে। কাল আর তুমি যজন-কার্য্যে বাহিরে যেতে পারিবে না।"

এক রাশ অন্ন হাতের থাবায় লইয়া মুক্তিকাম হাঁ করিয়া বলিলেন "কেন?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "এই গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে কল্য তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে, আমি রাঁধিয়া খাওয়াইব।"

মুক্তিকাম—"এত পয়সা আমার কিসে হইল? উৎসবটাই বা কি?" অনসূয়া—'তোমার অতি সামান্ত খরচেই হইবে,—যে সকল দগ্ধ তণ্ডুলকণা অভক্ষ্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি, তাহা এবং গরুর অখাদ্য পচা খইল ও তুষ—আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে!'

ব্রাহ্মণ ত অবাক্—গৃহিণীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে সংসার চলিবে কিসে, সিতিকেই বা কে রাখে ?

অনসূয়া বলিলেন, "তুমি 'হাঁ' করিয়া রহিলে যে,—বিশ্বাস হইল না—না, আমায় পাগল ঠাওরাইলে ? সে সকল কিছুই নহে, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, দৈব-বলে আমি এরূপ চমৎকার রান্না শিখিয়াছি যে, ঐ সকল জিনিষ পাইলে আমি অমৃত রাঁধিয়া দিব ;—পৃথিবীতে সেরূপ সুখাদ্য কেহ খায় নাই, তাহা স্বপ্নেও কেহ ধারণা করিতে পারে না ;—তুমি অবিশ্বাস করিয়া ঘাড় নাড়িতেছ। তোমাকে কাল আমার কথা মত কাজ করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণের কিছুতেই প্রত্যয় হয় না, কিন্তু স্ত্রীর একান্ত দ্বিধা-শূন্য ভাব দর্শনে এক এক-

বার ভাবেন কি জানি—"ন চ দৈবাৎ পরং বলং"—হইলে হইতে পারে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মুক্তিকাম সে রাত্রিতে আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। স্ত্রী যাহা এত আগ্রহে—এত উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, তাহা খণ্ডন করিলে, কান্নাকাটি ও দীর্ঘ-নিশ্বাসের চোটে নিদ্রা-দেবী সেই গৃহ হইতে সেই রাত্রির জন্য নিষ্ক্রান্ত হইবেন—সুতরাং মুক্তিকাম বিনা ওজরে স্ত্রীর সকল কথারই সম্মতি জানাইয়া হস্তপদ প্রসারণপূর্ব্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনসূয়া অমৃতের রন্ধন ও পরিবেশনের চিন্তায় সারা রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গৃহিণীর তাড়নায় ও শিক্ষামত মুক্তিকাম সেই পল্লীর সকল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন,—

তাঁহার পত্নী অমৃত রান্না করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আজ মধ্যাহ্নে সেই অমৃতের পরীক্ষা করিবেন। ভ্রাতা চলিয়া গেলে শ্রীকণ্ঠ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমাদিগকে লইয়া ঘর করা কেবলই বিড়ম্বনা, জিনিষ পত্র উৎকৃষ্ট দেখিয়া বাজার হইতে লইয়া আসি, আর রান্নার গুণে তাহা মুখে দেওয়ার উপায় নাই, কতকগুলি গরুর খাদ্য খাইয়া কেবল ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া আছি। আজ বড় দাদার স্ত্রী অমৃত রান্না করিতে শিখিয়াছেন। শুনিলাম তাহাতে ব্যয় বাহুল্যও কিছু নাই, সকলেই অদৃষ্ট।" শ্রীকণ্ঠ-পত্নী অমৃতরন্ধনে অপটু; সুতরাং মুখ নাড়া খাইয়া বিষণ্ণভাবে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

আজ মুক্তিকাম-ঠাকুরের গৃহে অমৃত রান্না,—ক্ষুদ্রপল্লীতে এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। শিশুগণ অমৃতভক্ষণের হর্ষে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নাচিতেছে। ব্রাহ্মণ-পল্লীতে নিমন্ত্রণের আকর্ষণ, তারপর দেব-দুর্ল্লভ অমৃত আস্বাদনের লোভ! এই উপলক্ষে কত স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্র যে পত্নী, ভগিনী ও মাতৃগণকে খোঁটা দিতেছেন তাহার অবধি নাই,—মুক্তিকামের স্ত্রী অনসূয়া-ঠাকুরাণীর যশের ভেরী পূর্ব্বেই বাজিয়া উঠিয়াছে।

১৬

মধ্যাহ্ন হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণ মুক্তিকামের গৃহে একত্র হইয়াছেন, সকলেই বলিতেছে,—'একটা পচা গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?' কেহ কেহ

আকার তুলিতেছেন। মুক্তিকাম পাগলের মত এক একবার রান্না-ঘরে যাইয়া বলিতেছেন,—“আঁনি (অনস্থয়ার সংক্ষেপ), তুই সর্ব্বনাশ করিলি, আজ ব্রাহ্মণগণ আমার মুখে চুণকালী দিয়া যাইবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না, তুই আমার পৈতৃক ভিটায় থাকিতে দিলি না। আমি পাগলীর কথা শুনিয়া পাগল হইয়াছিলাম,—এই দুর্গন্ধে পশু পর্য্যন্ত ছুটিয়া পলায়, ইহাই না কি অমৃত হইবে! হায় ভগবান্ আমার মুখরক্ষা কর। আমার সর্ব্বস্ব যাউক, আমি যেন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণদিগকে ভালরূপে খাওয়াইয়া সায়াহ্নে মৃত্যুমুখে পতিত হই,—এ বিপদ্ হইতে, হে দয়াল ঠাকুর, রক্ষা কর।’ এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মুক্তকর উর্দ্ধে তুলিয়া ভগবান্‌কে ডাকি-

তেছেন, আর তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রু-ধারা পড়িতেছে।

গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, 'তুমি পাগল হইলে নাকি ?—এই খাদ্য শালপত্রে পড়িলেই অমৃত হইবে, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা কর, দ্রব্যগুণে কি না হয়!'

রান্না যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই দুর্গন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কাপড় দ্বারা নাক বন্ধ করিয়া কোথা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে তাহারই স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা পাইতেছেন।

ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে বসিয়া গেলেন। অবগুণ্ঠনবতী অনসূয়া শাল-পত্রের উপর সেই খাদ্য কিছু কিছু রাখিয়া গেলেন। ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্রাহ্মণগণ দুর্গন্ধে

অস্থির হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ ক্ষুধার আতিশয্যে খাদ্যের দুই একটু অংশ মুখে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ ত্যাকার করিয়া ফেলিলেন। মুক্তিকাম মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণায় ক্রোধে অন্ধ হইয়া একটা বংশের লাঠী লইয়া অনসূয়াকে বিষম প্রহার করিলেন!

অনসূয়া ভূতলে পড়িয়া লজ্জায় মৃত্তিকায় মুখ লুকাইয়া রাখিলেন। সহস্র বৃশ্চিকে যেন তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তখন অনসূয়ার দর্প টুটিল; দর্পহারীর কৃপা হইল। সে সহসা উঠিয়া পাগলিনীর মত কুটীরে প্রবেশ করিয়া হাবার চরণে গড়াইয়া পড়িল— 'ঠাকুরপো, সে অমৃত তোর কৃপায় হইয়াছে, আমি তোর ভ্রাতৃবধূ, তোর ঘরের কুলরমণী আমায় এ লজ্জা হইতে রক্ষা কর, তোর পৃষ্ঠে

কত চেলাকাঠ ভাঙ্গিয়াছি, তোকে কত ভৎ সনা করিয়াছি, কত কুখাদ্য খাওয়াই-য়াছি। কাল তুই ঝাঁটা মারিয়া আমায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিস্, আজ এই ঘোর লজ্জা হইতে ভ্রাতৃবধুকে রক্ষা কর্, ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ হইতে তোর দাদাকে ও তোর বংশের বংশধর সিতিকে রক্ষা কর।” সংজ্ঞাহীনার মত অনসূয়া জড় ভরতের পদ-তলে লুটাইয়া পড়িল এবং বাণবিদ্ধা পক্ষি-ণীর ন্যায় ছটফট্ করিতে লাগিল।

তখন আস্তে আস্তে ধূলি-ধূসর জটিলমস্তক পুরুষবর স্বীয় কুটীর ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার মুখে কেহ কখনও ভাষা শোনে নাই, আজি তিনি দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলি-লেন,—“আপনারা আহারে বসিয়াছেন,

আহার করুন। গৃহস্বামীর অপরাধ লইবেন না। আপনারা যদি তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, তবে অমৃত হইতে বঞ্চিত হইবেন না, কারণ ক্ষমাতেই অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে।' ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন —হাবা কথা বলিতেছে—কণ্ঠ সুধামধুর —সৌজন্যের বিলাস।

ব্রাহ্মণগণকে উত্তর করিতে অবসর না দিয়া জড় ভরত প্রত্যেকের সম্মুখস্থ খাদ্যসহ শালপত্র স্পর্শ করিলেন, অমনই তাঁহাতে পদ্মগন্ধ ও অমৃতের আস্বাদ উপজাত হইল। ব্রাহ্মণগণ সেই অমৃতাস্বাদনে মুগ্ধ হইলেন—তাঁহাদের আর আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। তাঁহারা জড় ভরতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতে উদ্যত হইলেন। জড় ভরত বলিলেন, "আপনারা

গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন, ভোজনান্তে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা হইবে” এই বলিয়া তিনি স্বীয় কুটীরের দাওয়ায় নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণগণ আহারান্তে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। জড় ভরত বলিলেন, “আপনারা আমার কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আজ কথা বলিতেছি, চিরদিন আমাকে আপনারা হাবা বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমার পূর্ব্ব-পরিচয় আপনাদিগকে জানাইতেছি।

আমি পূর্ব্বে এক জন্মে ঋষভ-দেবের পুত্র ভরত ছিলাম। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, তথায় আমি তপস্যায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমি আপনাকে

মায়ার অতীত মনে করিয়াছিলাম, সেই অহঙ্কারে আমি মায়ায় পতিত হইলাম। একটা মৃগের জন্য আমি তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত মুগ্ধ হইয়া, শেষে মৃগচিন্তা করিতে করিতে মৃগযোনি প্রাপ্ত হইলাম।

মৃগ হইয়া আমি ভগবদারাধনার সুখ হইতে বঞ্চিত হই। তখন বড় খেদ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই খেদে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া পবিত্র হইলাম। পূর্ব্বজন্মের তপস্যানিবন্ধন ভগবান্ আমাকে জাতিস্মর করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধুসঙ্গের গুণে ও সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত তীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া আমার মৃগদেহ অচিরাৎ লয় পাইল।

তৎপর ব্রাহ্মণকুলে এই জন্ম লাভ করিয়া আমি ভাবিলাম, যাহাতে এ জন্মে

আর ভগবদারাধনায় ব্যাঘাত না ঘটে,—
জীবনে মরণে তাহারই চেষ্টা করিব। পুনর্ব্বার
পতিত হইবার ভয় আমাকে এতদূর অধি-
কার করিয়াছিল যে, আমি কাহারও সঙ্গে
কথা কহিতে সাহসী হই নাই। আমি সর্ব্বদা
একচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে আরাধনা করি-
য়াছি, ভগবান্ কি আমার উপর প্রসন্ন হই-
বেন না! আমি তাঁহাকে কোথায় পাইব!”
বলিতে বলিতে জড় ভরত সংজ্ঞা-হীনের
ন্যায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বদন হইতে
অলৌকিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল।
পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে সেই দেহ কদম্ব-কোরকবৎ
হইল। অপোগণ্ড শিশুর কমনীয়তা, তাঁহার
মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইল। তিনি মুক্তিকামের
অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া রহিলেন। এ ভাব ত
কতদিন হইয়াছে। হাবাকে ত তোমরা

কেহই দেখ নাই—কেহই চিন নাই। আজ কেহ মুখে সাবধানে ব্যজন করিতেছে, কেহ কর্ণে ভগবৎ নাম শুনাইতেছে, যেন স্বর্গের দেবতাকে ভূতলে পাইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ, মহাদেব, নীলাঞ্জনাথ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ আজ হাবাকে পাইয়া হারানিধির মত বক্ষে রাখিতে প্রস্তুত। দূরে—সমস্ত নর নারী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র—রান্নাঘরের পার্শ্বে আম্রবনতলে বসিয়া অনসূয়া হাবার সেই পূর্ণচন্দ্রনিভ বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন, "এই মুখে আমি দগ্ধ তণ্ডুল ও পচা খইল দিয়াছি। ঠাকুরপো, আমার আর গতি নাই।" তিনি এ গৃহে আর মুখ দেখাইবেন কিরূপে? নীলকণ্ঠ বলিল, 'বাবা, মা হাবাকে চিনিতেন, তাই এত

আদর করিতেন, আমরা স্পর্শমণি পাইয়া হেলা করিয়াছি।'

জড় ভরত কাহারও কোন উপরোধ অনুরোধ না মানিয়া হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। সেখানে সিন্ধুসৌবীরাধিপতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

হিমাদ্রি অনন্তকাল স্থিরভাবে বসিয়া আছে। কি এক মহিমাদর্শনে হিমাদ্রি ভাবে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার নড়িবার শক্তি নাই। সেই ভাবে বিস্ময়াপন্ন হইয়া হিমাদ্রি স্তব্ধ চিত্রের ন্যায় প্রশান্ত। বিশাল জটাজুটের মধ্যে তুষাররাশি এলাইয়া পড়িয়াছে। হরিদ্বারে জটার তুষার বিস্ময়ে বিগলিত হইয়া গঙ্গাস্রোতে পরিণত হইয়াছে। এই অফুরন্ত করুণা জগৎকে সুধা-মধুর করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রিকালে

সমাধি-প্রশান্ত গিরির ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় হয়। সমাধি ভঙ্গ হইলে দিবসে গিরিবরের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় সূর্য্য সমুদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করে, যোগভঙ্গের পরে যে জাগরণ তাহাতে প্রবৃত্তিনিচয় জাগিয়া উঠে। তৃতীয় নেত্রনিঃসৃত তীক্ষ্ণ রশ্মি সেই অজ্ঞান ধ্বংস করে। হে হিমাদ্রি, ভীষণ অজগর তোমার শরীরে বিহার করিতেছে, তোমার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহাদের ফণারক্ষিত বিষ তোমার অঙ্গধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেই মৃত্তিকায় নীলকান্তমণির সৃষ্টি হইতেছে—তোমার উপকণ্ঠে সেই মণির নীলিমা।

হে হিমাদ্রি, তুমি কি শৈলাধিরাজ না ভগবানের স্বহস্তে নির্ম্মিত প্রশান্ত শিবমূর্ত্তি? তোমারই স্থিরমূর্ত্তিতে যেন জড় ভরতের

—ভারতীয় সাধুর রূপের আভাস দেখিতে পাই ; নির্ব্বিকল্প ভারতীয় সাধুর চিত্র সেই হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত, উচ্চতায় জগতের সর্ব্ব-আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে বিস্ময়কর, হে চিরশান্ত, চিরসুন্দর সর্ব্বকালে পূজ্য শিব, আমি তোমাকে প্রণাম করি।